আমি পদ্মজা - ২১

সারা বাড়ির সব কাজ শেষ করে, হেমলতা ক্লান্ত পায়ে হেঁটে ঘরে আসেন। মোর্শেদ সবেমাত্র শুয়েছেন। হেমলতা বিছানার এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করেন। মোর্শেদ হেমলতার দিকে ফিরে ধীরকণ্ঠে বলেন,'ধানের মিলটা পাইয়া যাইতাছি।'

মোর্শেদের গলা দূর্বল হলেও খুশিতে চোখ চকচক করছে। হেমলতা মৃদু হেসে বলেন,'মাতব্বর কী যৌতুক দিচ্ছেন?'

মোর্শেদ হেসে বলেন,' সে কইতে পারো। সে আমারে কী কইছে জানো?'
'কী?'
'কইলো, শুনো মোর্শেদ...আইচ্ছা আগে শুনো আমি কিন্তু শহুরে ভাষায় কইতে পারুম না। আমি আমার গ্রামের ভাষায় কইতাছি।'
হেমলতা মোর্শেদের কথা বলার ভঙ্গি দেখে আওয়াজ করেই হাসলেন। বললেন,'আচ্ছা,যেভাবে ইচ্ছে বলো।'

মোর্শেদ খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করে বললেন,'কইলো,শুনো মোর্শেদ তোমার এই মোড়ল বাড়ি হইতাছে একটা বিল। যে বিলে একটাই পদ্ম ফুল আছে। এই পদ্ম ফুলডার জন্যই এই বিলটা এতো সুন্দর। আর আমি সেই পদ্ম ফুলডারে তুইললা নিয়া যাইতাছি। এই বিলে পদ্ম ফুলডার চেয়ে দামি সুন্দর আর কিছু নাই। তাই আমার আর কিছু লাগব না। বিনিময়ে আমি এই খালি বিলডারে ধানের মিল দিয়ে দিলাম। বুঝলা লতা? মাতব্বর মানুষটা সাক্ষাৎ ফেরেশতা। মন দয়ার সাগর।'
'হুম।' হেমলতা বললেন,ছোট করে। পুনরায় বললেন,'একটা কথা।'

মোর্শেদ জিজ্ঞাসু ইশারা করেন ভ্রু উঁচিয়ে। হেমলতা উঠে বসেন। বলেন,'লিখনকে মনে আছে? সে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল তোমাকে?'
মোর্শেদ লেশমাত্র অবাক হলেন না। দায়সারাভাবে বললেন,'এতদিনে জানলা? আমি মনে করছি কবেই জাইননা ফালাইছো।'
'আমি তো আর সবজান্তা নই। আমাকে বলোনি কেন?'
'বইললা কি হইতো? ছেড়ি বিয়া দিতা? আর ছেড়াডা নায়ক। কত ছেড়ির লগে ঘষাঘষি করে। ছেড়িগুলাও নষ্টা। নষ্টাদের সাথে চলে এই ছেড়ায়।'
'মুখ খারাপ করো না। ছেলেটার মধ্যে আমি তেমন কিছু দেখিনি। তুমি আমাকে জানাতে পারতে। নিশ্চিন্তে ছেলেটা সুপাত্র। বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে, সে মা বাবা নিয়ে আসলে আমি ফিরিয়ে দিতাম না। থাক...এসব কথা। এখন বলেও লাভ নেই। পদ্মজার মন স্থির আছে। পরিস্থিতি, ভাগ্য সেখানে নিয়ে যাচ্ছে,সেখানেই গা ভাসিয়ে চলুক। ঘুমাও এখন। ভোরে উঠে গোলাপ ভাইয়ের বাড়িতে যাবা। কত কাজ বাকি! বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ে কী সামান্য কথা!'

হেমলতা একা কথা বলতে বলতে অন্যদিকে ঘুরে শুয়ে পড়েন। কিছু সময়ের ব্যবধানে ঘুমিয়েও পড়লেন।

সকাল থেকে পূর্ণার দেখা নেই। পদ্মজা পূর্ণাকে খুঁজে বাড়ির পিছনে আসে। পূর্ণা সিঁড়িঘাটে বসে উদাস হয়ে কী যেন ভাবছে। পদ্মজা পা টিপে হেঁটে আসে। পূর্ণা বোনের উপস্থিতি টের পায়নি। পদ্মজা পূর্ণার পাশে বসে। তবুও পূর্ণা টের পেল না। পদ্মজা পূর্ণাকে ধাক্কা দিল। পূর্ণা চমকে তাকাল। বুকে ফুঁ দিয়ে বলল,'ভয় পাইছি।'

'উদাস হয়ে কী ভাবছিস?'
'কিছু না।'
'আবার ওইসব ভাবছিস! কতবার না করলে শুনবি বল তো?'
পূর্ণা নতজানু হয়ে রইল। ক্ষণকাল পার হওয়ার পর ভেজা কণ্ঠে বলল,'নিজের ইচ্ছায় মনে করে কষ্ট পেতে আমার ইচ্ছে করে না আপা। মনে পড়ে যায়।'
'চেষ্টা তো করবি। আর ভুলতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। এছাড়া অমানুষগুলো তাদের শাস্তি তো পেয়েছেই।'
পূর্ণা চোখের জল মুছে আগ্রহ নিয়ে বলল,'আম্মা তিন জনকে কী করে মারল আপা?'
'জানি না।'
'জিজ্ঞাসা করবা আম্মাকে?'
পদ্মজা ভাবল। এরপর বলল,'করব। আজ না অন্য একদিন।'
'বিয়ে করে তো চলেই যাবা।"

পদ্মজা অভিমানী হয়ে তাকাল পূর্ণার দিকে। বলল,'আর কী আসব না? ফিরে যাত্রা আছে। আবার এমনিতেও আসব। কয়দিন পর পর।'
'তাহলে কালাচাঁদের সাথে বিয়েটা সত্যিই হচ্ছে?'
'তুই কী মিথ্যে ভাবছিস?'
পূর্ণা বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে ফেলল। বলল,'লিখন ভাইয়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে।'

লিখন নামটা শুনে পদ্মজা অপ্রতিভ হয়ে উঠল। নিজেকে অপরাধী অপরাধী মনে হয়। তাই সে প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলল,'উনাকে পছন্দ না তাই কালা বলিস, ঠিক আছে। কিন্তু চাঁদ কেন বলিস বুঝলাম না।'

পূর্ণা আড়চোখে পদ্মজার দিকে তাকায়। এরপর যান্ত্রিক স্বরে বলল,'পাতিলের তলার মতো কালা হয়ে আমার চাঁদের মতো সুন্দর বোনকে বিয়ে করতেছে বলেই কালাচাঁদ ডাকি। নয়তো কালা পাতিল ডাকতাম। আবার দরদ দেখিয়ে বলিও না,উনি তো এতো কালা না। শ্যামলা।' কথা শেষ করে পূর্ণা ঠোঁট বাঁকাল।

পদ্মজা শব্দ করে হাসতে শুরু করল। কিছুতেই হাসি থামছে না। পূর্ণা পদ্মজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল,'তুমি খুব কঠিন আপা। খুব ধৈর্য্য তোমার,ঠিক আম্মার মতো।'

পদ্মজা হাসি থামিয়ে পূর্ণার দিকে তাকাল। সময়টা শুধু দুই বোনের। পদ্মজা মায়াবী স্বরে বলল,'আর তুই ঠিক আম্মার বাহ্যিক রূপের জোড়া পর্ব।'

প্রান্ত,প্রেমা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে নদীর ঘাটে। পদ্মজার উদ্দেশ্যে বলে,'বড় আপা দুলাভাই আসছে।'

Kobitor.com

আমির আসার খবর শুনেই বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে পদ্মজা নিজের ঘরে চলে গেল। এই লোকটা এতো বেহায়া আর নির্লজ্জ! গতকাল সকাল-বিকাল বাড়ির সামনে ঘুর ঘুর করেছে। সেই খবর পদ্মজা পেয়েছে। আজ একেবারে বাড়িতে! বিয়ের তো আর মাত্র তিন দিন বাকি। এতোটুকু সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রন করা কী সম্ভব নয়? পদ্মজা কপাল চাপড়ে বিড়বিড় করে,'এ কার সাথে বিয়ে হচ্ছে আল্লাহ।'

উঠানে হেমলতা ছিলেন। আমির বাড়ির ভেতর ঢুকেই হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করল। এরপর নতজানু হয়ে বলল,'কেমন আছেন আম্মা?'

হেমলতার চক্ষু চড়কগাছ! আমিরের সাথে মগা এসেছে। মগার হাতে মাছের ব্যাগ, মাথায় ঝুড়ি। তাতে মশলাপাতি সাথে শাকসবজি। বিয়ের আগে এতো বাজার আবার আম্মাও ডাকা হচ্ছে। অপ্রত্যাশিত ব্যাপার স্যাপার! হেমলতা ঢোক গিলে ব্যাপারটা হজম করে নেন। ধীরেসুস্থে বলেন,'ভালো আছি। তুমি ভালো আছো? বাড়ির সবাই ভালো আছে?'
'জি,জি। সবাই ভালো।'

আমির মগাকে ইশারা করল। মগা বারান্দায় মাছের ব্যাগ, মাথার ঝুড়ি রাখল। হেমলতা আমিরকে বললেন,'এতসব বিয়ের আগে আনার কী দরকার ছিল? পাগল ছেলে।'
আমির হেসে ইতস্ততভাবে নতজানু অবস্থায় বলল,'এমনি।'
'যাও ঘরে গিয়ে বসো।'
'আম্মা...'
হেমলতা চলে যেতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়েন। আমির বলল,'আম্মা, ক্ষমা করবেন। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে হবে।'
'কোনো দরকার কী ছিল?'
'আ..আসলে আম্মা। পদ্মজার সাথে একটু কথা ছিল।'

আমির উসখুস করছে। খুব অস্থির। হাত,পা এদিকওদিক নাড়াচ্ছে। কিন্তু চোখ মাটিতে স্থির। হেমলতা আমিরকে ভাল করে পরখ করে নিয়ে বললেন,'ঘরে আছে নয়তো ঘাটে।'

অনুমতি পেয়ে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে গেল আমির। হেমলতা আমিরের যাওয়ার পানে চেয়ে থেকে ভাবেন,ছেলেটার সাথে এখনও চোখাচোখি হয়নি। সবসময় মাথা নত করে রাখে। কিন্তু কথাবার্তায় মনে হলো,লাজুক নয় এই ছেলে। হয়তো গুরুজনদের সামনে মাথা নিচু করে রাখা ছোটবেলার স্বভাব। হেমলতা মুচকি হেসে লাহাড়ি ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

পদ্মজার ঘরের শেষ প্রান্তে বারান্দা আছে। বারান্দা পেরোলেই বাড়ির পিছনের দরজা। আমির আসছে শুনে ঘর আর বারান্দার মাঝ বরাবর দরজায় পর্দা টানিয়ে দিল পদ্মজা। আমির ঘরের পাশে দাঁড়াল। পদ্মজা বারান্দার দিকে। পর্দার কাপড় পাতলা,মসৃণ। আমির স্পষ্ট পদ্মজার অবয়ব দেখতে পাচ্ছে। তিরতির করে বাতাস বইছে। সেই বাতাসে পদ্মজার কপালে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো উড়ছে অবাধ্য হয়ে। আমির ডাকল,'পদ্মজা?'
'হু?'
'কেমন আছো?'

'ভালো। আপনি?'
'ভালো।'
বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা! পদ্মজা বলল,'কী বলবেন বলুন।'
'মায়াভরা চোখগুলো দেখার সৌভাগ্য কী হবে?'

আমিরের কণ্ঠে আকুতি! তৃষ্ণা! পদ্মজার অস্বস্তি হচ্ছে। বেহায়া মানুষ বড়ই বিপদজনক। সে পালানোর জন্য পা বাড়াতেই আমির হই হই করে উঠল,'কসম লাগে পালাবে না।'
পদ্মজা মাথার ওড়না টেনে নিয়ে বলল,'দরকারি কথা থাকলে বলে চলে যান।'
'তাড়িয়ে দিচ্ছো?'
'ছিঃ না।'
'তোমায় না দেখলে আজ আর প্রাণে বাঁচবো না। রাতেই ইন্না লিল্লাহ...'
'রসিকতা করবেন না। কাউকে না দেখে কেউ মরে না।'
'পদ্মবতীর রূপ যে পুরুষ একবার দেখেছে সে যদি বার বার না দেখার আগ্রহ দেখায় তাহলে সে কোনো জাতেরই পুরুষ না। একবার দেখা দাও। কসম লাগে...'
'বার বার কসম দিয়ে ঠিক করছেন না।'
'আচ্ছা,কসম আর কসম দেব না। একবার দেখা দাও।'

পদ্মজার দুই ঠোঁট হা হয়ে গেল। কী বলে মানুষটা! কসম করেই বলছে আর কসম দিবে না।
আমির ধৈর্য্যহারা হয়ে বলল,'পদ্মবতী অনুরোধ রাখো...'
'এভাবে বলবেন না। নিজেকে ছোট লাগে।'
'পর্দা সরাব?'

পদ্মজা ঘামছে। বাতাসে অস্বস্তি। নিঃশ্বাসে অস্বস্তি। তবুও সায় দিল। আমির পর্দা সরিয়ে খুব কাছে পদ্মজাকে দেখতে পেল। কালো রঙের সালোয়ার কামিজ পরা পদ্মবতী। কপাল অবধি টেনে রাখা ঘোমটা। পদ্মজা চোখ তুলে তাকাতেই আমির বলল,'জীবন ধন্য।'

পদ্মজা হাসি সামলাতে পারল না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসল। আমির বলল,'এ মুখ প্রতিদিন ভোরে দেখব। আর প্রতিদিনই জীবন ধন্য হবে। এমন কপাল কয়জনের হয়।'
পদ্মজা কিছু বলল না। আমির আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল,'আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমার হাতে খুন হয়ে যাই।'
পদ্মজা চমকে উঠল। আশ্চর্য হয়ে বলল,'আপনি পাগল।'
আমির কণ্ঠ খাদে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল,'তোমার উপস্থিতি আমার নিঃশ্বাসের তীব্রতা কতটা বাড়িয়ে দিয়েছে টের পাচ্ছো?'
পদ্মজা দূরে সরে গেল। মনে মনে বলল,'উফ! আল্লাহ আমি পাগল হয়ে যাব। এ কার পাল্লায় পড়লাম। জ্ঞানবুদ্ধি,লাজলজ্জা কিছু নেই।'
আর মুখে আমিরকে বলল,'পেয়েছি। এবার আসি।'

আমিরকে কিছু বলতে না দিয়ে পদ্মজা বারান্দা ছাড়ল। বাড়ির পিছনে মগাকে পেল।মগার পথ আটকে বলল,'মগা ভাই।'
মগা সবগুলো দাঁত বের করে হাসল। বলল,'জ্বে ভাবিজান।'

Kobitor.com

মগার মুখে ভাবি ডাক শুনে পদ্মজা বিরক্ত হলো। কিন্তু প্রকাশ করল না। বিরক্তি লুকিয়ে বলল,'লিখন শাহর কথা আপনি উনাকে বলেছেন?'
'উনিটা কে?'
'আপনার আমির ভাই।'
'জ্বে ভাবিজান।'

মগার অকপট স্বীকারোক্তি! পদ্মজা এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না। মগাকে পাশ কেটে চলে গেল। মগা দৌড়ে এসে পদ্মজার পথ রোধ করে দাঁড়াল। ফিসফিসিয়ে গোপন তথ্য দিল। আগামী দুই দিনের মধ্যে লিখন শাহ আসছে। তার বাবা মাকে নিয়ে। খবরটা মগা গত সপ্তাহ পেয়েছে। পদ্মজার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল। ঢোক গিলে নিজেকে আশ্বস্ত করে নিল। সে তো কথা দেয়নি বিয়ে করার। আর না কখনো চিঠি দিয়েছে। লিখন শাহ নিরাশ হলে এটা তার দোষ নয়,লিখন শাহর ভাগ্য। তবুও পদ্মজার খারাপ লাগছে। অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। জীবনে আবার কী কিছু ঘটতে চলেছে? বুক ধড়ফড়,ধড়ফড় করছে। পদ্মজা ঘাটের সিঁড়িতে বসে রইল ঝিম মেরে।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ২২
_____
মোড়ল বাড়ির আনাচেকানাচে আত্মীয়স্বজনদের কোলাহল। পদ্মজা বিছানার এক কোণে চুপটি করে বসে আছে। ঘরে দুষ্টু রমণী আছে কয়েকজন। নিজেদের মধ্যে রসিকতা করছে। উচ্চস্বরে হাসছে। অথচ এরাই বিপদের সময় পাশে ছিল না। ভীষণ গরম পড়েছে। পদ্মজার পরনে সুতার কাজ করা সুতি শাড়ি। গরমে শুধু ঘামছে না। বমি পাচ্ছে। প্রেমা পদ্মজার পাশে বসে ছিল। পদ্মজা প্রেমাকে ফিসফিসিয়ে বলল,'এই বনু? আম্মাকে গিয়ে বলবি লেবুর শরবত দিতে?'

প্রেমা মাথা নাড়িয়ে চলে গেল শরবত আনতে। হেমলতা রান্নাঘরে ছিলেন। প্রেমা লেবুর শরবতের কথা বললে তিনি বললেন,'তুই যা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

লেবু গাছ থেকে সবেমাত্র ছিঁড়ে আনা পাকা লেবুর শরবত বানিয়ে পদ্মজার ঘরের দিকে এগোলেন তিনি। গিয়ে দেখলেন পদ্মজা বিছানার এক পাশে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। উসখুস করছে। ঘরভর্তি অন্যান্য মানুষে।তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেন,'সবাই অন্য ঘরে যাও। পদ্মজাকে একা ছাড়ো।'

হেমলতার এমন আদেশে অনেকের রাগ হলেও বেরিয়ে গেল। তিনি দরজা বন্ধ করে শরবতের গ্লাস পদ্মজার হাতে তুলে দিয়ে বলেন,'সব সময় মুখ বন্ধ রাখা ভালো না। যারা বিপদে পাশে থাকে না তাদের জন্য বিন্দুমাত্র অসুবিধার মুখোমুখি হবি না। গরমে তো শেষ হয়ে যাচ্ছিস। জানালার পাশটাও অন্যরা ভরাট করে রেখেছিল। ভালো করেই সরতে বলতি।'

পদ্মজা মায়ের কথার জবাব না দিয়ে এক নিঃশ্বাসে লেবুর শরবত শেষ করল। এবার একটু আরাম লাগছে। আলনার কাপড় গুলো অগোছালো। সকালেই তো ঠিক ছিল। নিশ্চয় মেয়েগুলির কাজ। হেমলতা আলনার কাপড় ঠিক করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন ,'কী নিয়ে এত চিন্তা করছিস?'

পদ্মজা কিছু না বলে বিছানায় আঙ্গুল দিয়ে আঁকিবুঁকি করতে থাকল। পদ্মজার অস্বাভাবিকতা দেখে হেমলতা কপাল কুঁচকালেন।

'বলবি তো?'
পদ্মজা বিচলিত হয়ে বলল,'আম্মা উনি বোধহয় আজ আসবেন।'
'উনি? উনি কে? আমির?'
'না আম্মা। লিখন শাহ যে,উনি।'

হেমলতা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,'কপালে যা আছে তাই তো হবে। ভাবিস না। আমি আছি,সব সামলে নেব। লিখনকে আমি বুঝাব।'
হেমলতার কথা শেষ হতেই,পদ্মজা ভেজা কণ্ঠে বলল,'উনি খুব কষ্ট পাবেন আম্মা।'
হেমলতা অবাক হয়ে তাকান পদ্মজার দিকে। পদ্মজা এতো ব্যকুল কেন হচ্ছে? তিনি কী পদ্মজার অনুভূতি চিনতে ভুল করছেন?নাকি শুধুমাত্র কারো মন ভাঙবে ভেবে,পদ্মজার এতো ব্যাকুলতা!হেমলতা দোটানায় পড়ে যান। পদ্মজার জীবনে এ কেমন টানাপোড়ন! এই মুহূর্তে পদ্মজাকে বুঝে উঠতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি। ওদিকে হানি ডাকছে। হেমলতার বড় বোন হানি,গতকাল ঢাকা থেকে গ্রামে এসেছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছে। হেমলতা দরজার দিকে পা বাড়ান। তার আগে বলে গেলেন,'আমার নোংরা অতীত শুনাব আজ। বাকি সিদ্ধান্ত তোর। যা চাইবি তাই হবে। মনে রাখিস,যা চাইবি তাই পাবি।'

পদ্মজা কিছু বলার আগে হেমলতা চলে গেলেন। পদ্মজার বুকের ভেতর অপ্রতিরোধ্য তুফান শুরু হয়। মায়ের অতীত জানার জন্য কত অপেক্ষা করেছে সে। আজ যখন সেই সুযোগ এলো,তার ভয় হচ্ছে খুব। কেন হচ্ছে জানে না। কিন্তু হচ্ছে। হাত,পায়ের রগে রগে শিরশির অনুভূতি।

_____
ভ্যানগাড়িতে চড়ে অলন্দপুরের আটপাড়ায় ঢুকল লিখন শাহ। সাথে বাবা-মা এবং বোন। বাবা শব্দর আলী, মা ফাতিমা বেগম। বোন লিলি। শব্দর আলী চশমার গ্লাস দিয়ে গ্রামের ক্ষেত দেখছেন। আর বার বার বলছেন,'এই তো আমার দেশ। এই তো আমার বাংলাদেশ।'

ফাতিমা ভীষণ বিরক্ত ভ্যানে চড়ে। উনার ইচ্ছে ছিল কোনো মন্ত্রীর মেয়েকে ঘরের বউ করে আনবেন। আর ছেলের নাকি মেয়ে পছন্দ হয়েছে গ্রামে। ছেলের জেদের কাছে হেরে আসতেই হলো।

লিখনের পরনে ছাইরঙা শার্ট। চোখে সানগ্লাস। উত্তেজনায় তার হাত পা কাঁপছে রীতিমতো। এমন একটা দিন নেই, যেদিন পদ্মজার কথা ভেবে শুরু হয়নি। এমন একটা রাত নেই, যে রাতে পদ্মজাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা হয়নি। মাঝের সময়ের ব্যবধানে পদ্মজাকে খুব বেশি ভালবেসে

ফেলেছে সে। স্বপ্নে কোমরে আঁচল গুঁজে ঘরের কাজ করা পদ্মজাকে দেখতে পায়। কখনো বা অপরূপ সুন্দরী পদ্মজাকে ঘুমের ঘোরে ঠিক বিছানার পাশে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখতে পায়। কল্পনার পদ্মজাকে নিয়ে সে সংসার পেতেছে। এবার হয়তো সত্যি হতে চলেছে। লিখন আনমনে হেসে উঠল। মনে পড়ে যায় পদ্মজাকে প্রথম দেখার কথা। সঙ্গে,সঙ্গে বুকের মধ্যে অদ্ভুত ঝড় শুরু হয়। কী মায়াবী, কি স্নিগ্ধ একটা মুখ। তার চেয়েও সুন্দর পদ্মজার ভয় পাওয়া। লজ্জায় পালানোর চেষ্টা। পর পুরুষের ভয়ে আতঙ্কে থাকা। লিখন আওয়াজ করে হেসে উঠল। ফাতিমা,শব্দর অবাক হয়ে তাকালেন। লিলির এসবে খেয়াল নেই। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। লিখন মা-বাবাকে এভাবে থাকাতে দেখে,খুক খুক করে কাশল। এরপর বলল,'সুন্দর না গ্রামটা? বুঝছো আব্বু, এই গ্রামটাই এতো সুন্দর যে আবার আরেকটা সিনেমার জন্য আসতে হবে আগামী বছর।'

শব্দর আলী প্রবল আনন্দের সাথে বলেন,'সে ঠিক বলেছিস। মন জুড়িয়ে যাচ্ছে দেখে। চারিদিকে গাছপালা,নদী। রাস্তাঘাটও খুব সুন্দর। এখানে একটা বাড়ি বানালে কেমন হয়?'

লিখন গোপনে দীর্ঘশ্বাস লুকালো। তার বাবা যখন যেখানে যায় সেখানেই বাড়ি বানানোর স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু বানানো আর হয় না।

ফাতিমা বিরক্ত গলায় বললেন,'তা আমরা উঠছি কার বাড়ি? তোর পছন্দ করা মেয়ের বাড়ি নাকি অন্য কোথাও?'

মায়ের চোখেমুখে বিরক্তি দেখে লিখনের হাসি পেল। বলল,'তোমাকে রাগলে এতো ভালো লাগে আম্মু।'

ফাতিমা আড়চোখে ছেলের দিকে তাকান। প্রশংসা শুনতে তিনি বেশ পছন্দ করেন। লিখনের মুখে প্রশংসা শুনে একটু নিভলেন।

'হয়েছে, আর কতক্ষণ? '

'পাঁচ মিনিট। অলন্দপুরের মাতব্বর বড় মনের মানুষ। আমাকে নিজের সন্তানের দৃষ্টিতে দেখেন। যতদিন ছিলাম প্রতিদিন খোঁজ নিয়েছেন। নিজের একজন লোককে আমার সহায়ক হিসেবেও দিয়েছিলেন! উনার বাড়িতেই উঠব।'
লিলি চোখমুখ বিকৃত করে বলল,'অন্যের বাড়িতে উঠব! উফ।'
'মারব ধরে। অন্যের বাড়ি তোর কাছে,আমার কাছে না। মজিদ চাচার বউ ফরিনা চাচি এতো ভাল রাঁধেন। আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন। উনার একটাই ছেলে। ঢাকায় পড়ছে,ব্যবসা সামলাচ্ছে। তার সাথে অবশ্য সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু ফরিনা চাচি সারাক্ষণ ছেলে,ছেলে করতেন। আমাকে পেয়ে ছেলের সব ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন। তাই ওই বাড়ি আমার কাছে আপন না লাগুক,পরও লাগে না। আর বিশাল বাড়ি। উনারা বিব্রত হবেন না। তিন-চার দিনেরই তো ব্যাপার।'

লিখনের এতো বড় বক্তব্যের পাছে কেউ কিছু বলার মতো পেল না।

হাওলাদার বাড়ির সামনে এসে ভ্যান থামে। বাড়ির চারপাশ সাজানো দেখে লিখন বেশ অবাক হলো। লিলি চারপাশ দেখতে দেখতে বলল,'দাদাভাই, তুমি বিয়ে করতে এসেছো এই খবর উনারা পেয়েছেন বোধহয়। তাই এতো আয়োজন।'

লিখন লিলির মাথায় গাট্টা মেরে বলল,'বাড়িতে দুটো মেয়ে আছে। তাদের কারো বিয়ে হবে হয়তো। চল।'

ইটের বড় প্রাচীর চারদিকে। মাঝে বড় গেইট। প্রাচীরের উচ্চতা ১৫ ফুট। আর গেইটের উচ্চতা বারো ফুট। গেইটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন লোক। দুজনই লিখনকে চিনে। তাই লিখনকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিল। গেইট পার হলেই খোলা জায়গায়। প্রচুর গাছপালা। বেশি সুপারি গাছ এবং তালগাছ। সবকিছু সুন্দর! দুই মিনিট হাঁটার পর রঙ করা টিনের একটা বড় ঘর। তার সামনে সিঁড়ি। সিঁড়ির দু'পাশে সিমেন্টের তৈরি বসার বেঞ্চি। এই ঘরটাকে গ্রামে আলগ ঘর বলা হয়,কেউ কেউ আলগা ঘর বলে থাকে। অতিথিরা এসে বিশ্রাম করে। রাত্রিযাপন করে।ভেতরে ইট সিমেন্টের তৈরি দু'তালা অন্দরমহল। আলগ ঘরের বারান্দায় বসে ছিলেন মজিদ মাতব্বর,ফরিনা, রিদওয়ান। লিখনকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে উনারা অবাক হোন। সেই সাথে খুশিও। শহরের চারজন মানুষ হেঁটে আসছে। সর্বাঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া। দেখতেও ভালো লাগে। লিখন বারান্দায় পা রাখতেই মজিদ মাতব্বর হেসে বলেন,'আজকের দিনটা সত্যি খুব সুন্দর।'

লিখন হাসল। ফরিনা এবং মজিদ মাতব্বরকে সালাম করে বলল,'এই হচ্ছেন আমার বাবা- মা আর বোন। আর আম্মু,আব্বু উনি হচ্ছেন মজিদ চাচা। আর ইনি ফরিনা চাচি। আর ওইযে বড় বড় গোঁফদাড়িওয়ালা উনি হচ্ছেন রিদওয়ান ভাইয়া। এই বাড়িরই আরেক ছেলে।'

মজিদ মাতব্বর একজনকে ডেকে বলেন,চেয়ার দিয়ে যেতে। আর অন্দরমহলে খবর পাঠাতে মেহমান এসেছে। তাৎক্ষণিক চেয়ার ও ঠান্ডা শরবত চলে আসে। পরিচিয় পর্ব শেষ হতেই লিখন প্রশ্ন করল,'বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান চলছে নাকি?'
'সে চলছে। আমার ছেলেটার বিয়ে। একমাত্র ছেলে।'

লিখন হাসে। চোখ পড়ে আলগ ঘরের ডান পাশে। কয়েকটা মেয়ে উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে। লিখন আনমনে হেসে উঠল। কোনো মেয়ে যখন তাকে দেখে খুব তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি হয়। নায়ক কী এমনি এমনি হওয়া। শব্দর আলী জিজ্ঞাসা করলেন,'তাই নাকি? তাহলে তো ঠিক সময়েই এসেছি। আমরাও একমাত্র ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়েই এই গ্রামে এসেছি।'

মজিদ মাতব্বর আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন,'মেয়ে কে? কার মেয়ে? আমাকে বলুন। এখুনি বিয়ে করতে চাইলে এখুনি হবে।'
শব্দর আলী লিখনকে প্রশ্ন করেন,'মেয়ের পরিচয় বল।'
লিখন কথা বলার পূর্বেই ফরিনা গেইটের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন,'এই তো আমার ছেড়ায় আইয়া পড়ছে। আমির এইহানে আয়। দেইখা যা কারা আইছে।'

ফরিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই পিছনে তাকাল। আমির চুল ঠিক করতে করতে এগিয়ে আসছে। হাঁটার গতিতে বোঝা যাচ্ছে,বেশ চঞ্চল একটা ছেলে। আমির ঘেমে একাকার। কয়েক ফুটের দূরত্ব থাকা অবস্থায় লিখনকে দেখেই আমির চিনে ফেলল। মগার কাছে লিখনের বর্ণনা

শুনেছে। এছাড়া লিখন একজন নামকরা অভিনেতা। তার অভিনীত ছায়াছবি সে দেখেছে। আমির হাঁটার গতি কমিয়ে এগিয়ে এলো। লিখন উঠে দাঁড়াল। হেসে আমিরের সাথে করমর্দন করল। এরপর বলল,'আমি লিখন শাহ।'

আমির বলল,'আমির হাওলাদার। বসুন আপনি।'

লিখন নিজ স্থানে বসল। আমির একটু দূরত্ব রেখে দূরে বসল। মজিদ মাতব্বর আমিরকে লক্ষ্য করে বললেন,'কোথায় থাকিস সারাদিন। বলেছিলাম না,লিখন শাহ এসেছিল? এইযে ইনি।'
আমির শুষ্কমুখে বলল,'চিনি আমি। উনার অনেক কাজ(ছবি) আমার দেখা।'

শব্দর আলী,ফাতিমা,লিলি,লিখন সবাই হাসল। কেউ চিনে বললে আনন্দ হবারই কথা। রিদওয়ান আমিরকে বলল,' জানিস আমির,লিখন বিয়ে করতে গ্রামে আসছে।'

আমির কিছু বলল না। ফরিনা জানতে চান,'পাত্রী কে? কইলা না তো?'

লিখন বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে বলল,'পদ্মজা। মোড়ল বাড়ির বড় মেয়ে।'

লিখনের কথা শুনে মুহূর্তে হাওলাদার বাড়ির সব মানুষের মুখ কালো হয়ে গেল।আলগ ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েগুলির কোলাহল থেমে গেল। চারিদিক স্তব্ধ, শান্ত। লিখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কী হলো সবার! লিখন মা-বাবার সাথে চাওয়াচাওয়ি করল। মজিদ মাতব্বর শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,'তার সাথে তোমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল?'
মজিদ মাতব্বরের কথা বলার ধরণ পাল্টে যাওয়াতে লিখন আহত হলো। বলল,'না। এখন প্রস্তাব দিতে চাই।'
'পদ্মজার সাথেই পরশু আমিরের বিয়ে।'

লিখন চকিতে চোখ তুলে তাকাল। বুক পোড়ার মতো অসহনীয় যন্ত্রনা কামড়ে ধরে সর্বাঙ্গে। হাড়ে হাড়ে বরফের ন্যায় ঠান্ডা কিছু ছুটতে থাকে। এখুনি যেন সব রগ ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ২৩

ফাতিমা করুণ চোখে লিখনের দিকে তাকান। চোখে চোখ পড়তেই লিখন হাসার চেষ্টা করল। তার দৃষ্টি এলোমেলো। কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। আমির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। 'আব্বা আসছি' বলে জায়গা ত্যাগ করে। শব্দর আলী মজিদ মাতব্বরকে প্রশ্ন করলেন,'মজা করছেন?'

মজিদ মাতব্বর শব্দর আলীর চোখের দিকে সরাসরি চোখ রেখে জবাব দিলেন,'প্রথম পরিচয়ে মজা করার মতো মানুষ আমি নই ভাইসাহেব।'

লিলি এক হাত লিখনের পিঠের উপর রাখল।ডাকল,'ভাইয়া।'

লিখন লিলির হাতটা মুঠোয় নিয়ে ঢোক গিলল। বলল,'বিয়ে হবে না তো কী? বলেছি যখন দেখাবোই।'

'ভাইয়া তোর চোখে জল।'

লিখন দ্রুত হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। পরিবেশ থম মেরে গেছে। কেউ কিছু বলার মতো খুঁজে পাচ্ছে না। লিলি অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তার ভাইয়ার দিকে। পদ্মজা নামের মেয়েটাকে নিয়ে কত গল্প শুনেছে সে। মেয়েটা তার বয়সী শুনে লিলি খুব হেসেছিল। তার ভাইয়া এতো ছোট মেয়ের প্রেমে পড়েছে! দিনগুলো কত যে সুন্দর ছিল! মেট্রিক পরীক্ষার সময় বার বার খোঁজ নিয়েছে কবে শেষ হবে পরীক্ষা। যেদিন শেষ হলো সেদিন থেকেই শুটিং শুরু হলো। কথা ছিল এক সপ্তাহ পর থেকে শুরু হবে। কিছু জরুরি কারণে আগে শুরু হয়ে গেল। তাই আসতে কয়েকদিন দেরি হলো। মজিদ মাতব্বর স্তব্ধতা কাটিয়ে বললেন,'বিয়েটা একটা দূর্ঘটনার জন্য খুব দ্রুত ঠিক হয়েছে।'

লিখন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,'কী দূর্ঘটনা?'
ফরিনা সন্দিহান গলায় বললেন,'তার আগে তুমি কও তো, পদ্মজার লগে কী তোমার প্রেম-ট্রেম আছিল?'
লিখন ফরিনার প্রশ্নে বিব্রতবোধ করল। ধীরকণ্ঠে জবাব দিল,'না। শুধু আমার পক্ষ থেকেই।'

লিখনের উত্তরে ফরিনা সন্তুষ্ট হলেন। শব্দর আলী কী দূর্ঘটনা ঘটেছিল জানতে চাইলেন। মজিদ মাতব্বর সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সব বলেন। সব শুনে লিখন আশার আলো দেখতে পায়। ভাবে, এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে তাই অন্য কেউ পদ্মজাকে বিয়ে করবে না। এমনটা ভেবেই হয়তো পদ্মজার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে যদি এখুনি বিয়ে করতে রাজি থাকে। তাকে ফিরিয়ে না দিতেও পারে। আর পদ্মজা কী বিন্দুমাত্র ভালোবাসে না তাকে? বাসে, নিশ্চয় বাসে। লিখন নিজেকে নিজে স্বান্তনা দেয়। শব্দর আলী আফসোস নিয়ে বললেন,'কী আর করার! পরিস্থিতি হাতের বাইরে।'

'আপনারা কিন্তু বিয়ে শেষ করে তবেই যাবেন।' বললেন মজিদ মাতব্বর।
ফাতিমা মতামত জানালেন দৃঢ়ভাবে,'না, না আজই চলে যাব। এই গ্রামে আর এক মুহূর্ত না।'
শব্দর আলী মৃদু করে ধমকে বললেন,'কী বলছো? কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা। এখন ট্রেন পাবে কোথায়? কাল ভোরে নাহয় চলে যাব।'
রিদওয়ান অনুরোধ করে বলল,'বিয়েটা শেষ হওয়া অবধি থেকে যান। দেখুন, মেহমান হয়ে এসেই অপ্রত্যাশিত খবর শুনলেন। এজন্য খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু তো করার নেই। মেয়েটা জলে ভাসবে বিয়েটা না হলে।'
লিখন সঙ্গে,সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল,'পদ্মজাকে ফেলনা ভাবছেন কেন? কেউ অপবাদ দিলেই কী সে পঁচে যায়?'

রিদওয়ান কিছু বলতে গেলে মজিদ মাতব্বর কড়া চোখে তাকিয়ে থামতে বললেন। এরপর শিখাকে ডেকে বলেন,'উনাদের ঘরে নিয়ে যাও। আর আপনারা না করবেন না। আমি আপনাদের অবস্থা বুঝতে পারছি। বিয়ে অবধি না থাকুন। রাতটা থেকে যান।'

বাধ্য হয়ে ফাতিমা থাকতে রাজি হলেন। তিনি রাগে ফোঁসফোঁস করছেন। সব রাগ পড়েছে হাওলাদার বাড়ির উপর। মনে মনে এই বাড়ির বিনাশ চাইছেন তিনি। মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। লিখন তার চোখের মণি। নয়তো কী গ্রামের মেয়ে নিতে আসতেন! আর সেই ছেলের মন এভাবে ভাঙল! ঘরে ঢুকেই চোখের চশমা ছুঁড়ে ফেলেন বিছানায়। কটমট করে শব্দর আলীকে বললেন,'তোমার না এক বন্ধু আছে মেজর। তাকে কল করে বলো মেয়েটাকে তুলে এনে লিখনের সাথে বিয়ে দিতে। আমার ছেলেকে হারতে দেখতে পারব না।'
'আহ! চুপ করো তো। সব জায়গায় ক্ষমতা চলে না। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করো।'

'কিসের পরিস্থিতি? তুমি জানো, তোমার ছেলের ব্যাক্তিগত ডায়রিতে আগে শুধু আমার নাম ছিল। সেখানে এখন বেশিরভাগ পদ্মজা নামটা লিখা। কতটা পাগল এই মেয়ের জন্য। এখন মেয়েটাকে ছেড়ে শহরে চলে গেলে,ছেলের দেবদাস রূপ দেখতে হবে। আর আমি তা পারব না।'

শব্দর আলী পায়ের মোজা খুলতে খুলতে বিরক্তি নিয়ে বললেন,'তোমার যা ইচ্ছে করো। আমি পারব না। ক্লান্ত আমি। শান্তি দাও।'

ফাতিমা কড়া কিছু কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। লিলি ঘরে ঢুকেছে। লিখন আসেনি। আমেনা লিলিকে বললেন,'লিখন কোথায়?'

'কী জানি! ভাইয়া ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

রোদের কঠিন রূপ শীতল হয়ে এসেছে। মৃদু বাতাস বইছে। তবুও লিখন ঘামছে। সে পদ্মজাদের বাড়ি যাচ্ছে। আতঙ্কে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। মাথায় শুধু কয়টা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে,'আমি কী পাগলামি করছি? এতো আয়োজন ভেঙ্গে কী আমার হাতে তুলে দিবেন পদ্মজাকে? পদ্মজা আমাকে দেখলে কী কাঁদবে? ভালোবাসেনি একটুও? মায়া নিশ্চয় জমেছে?' লিখন আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে,'আল্লাহ, সব যেন ভালো হয়।'

পূর্ণা বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে আছে। বাড়ির পিছনে গীত গাইছে অনেকে। সাথে তাল মিলিয়ে দুই বুড়ি নাচ করছে। পুরো বাড়ি সাজানো হচ্ছে রঙিন কাগজ দিয়ে। উঠানের এক কোণে লাল বড় গরু বাঁধা। বিয়ে উপলক্ষে জবাই করা হবে। চারিদিকের এতো আনন্দ পূর্ণার মন ছুঁতে পারছে না। প্রথমত, সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত! কিছুতেই স্থির হতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, পদ্মজার জন্য লিখন শাহ ছাড়া অন্য কাউকে তার পছন্দ হচ্ছে না। সব মিলিয়ে সে বিরক্ত। চোখ ছোট করে বাচ্চাদের খেলা দেখছে। হুট করে চোখে ভাসে লিখনকে। পূর্ণা দ্রুত চোখ কচলে আবার তাকাল। সত্যি তাই। খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে সে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায় পদ্মজার ঘরে। পদ্মজার কানে কান গিয়ে বলে,'লিখন ভাই আসছে। তুমি কিন্তু পালিয়ে যাবে আপা। এই বিয়ে কিছুতেই করবে না।'

কথা শেষ করে খুশিতে আবার ছুটে যায় বারান্দায়। এমন দিনে লিখনের উপস্থিতি পদ্মজাকে অপ্রস্তুত করে তুলে। গলা শুকিয়ে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। লিখন বাড়িতে ঢুকে অবাক হয়ে সব দেখে। কত আয়োজন! কত মানুষ! তার স্বপ্নের রানি পদ্মজার বিয়ে। কিন্তু তার সাথে না। ভাবতেই, লিখনের বুক ছ্যাঁত করে উঠল। মেয়েরা খুব আগ্রহ নিয়ে সুদর্শন লিখনকে দেখছে। লিখন পূর্ণাকে বারান্দায় দেখে এগিয়ে আসল। প্রশ্ন করল,'কেমন আছো পূর্ণা?'

পূর্ণা খুশিতে উচ্চকণ্ঠে জবাব দেয়,'ভালো,খুব ভালো। ভাইয়া আপনি...'

পূর্ণা থেমে গেল। অনেকে তার উচ্চ গলার স্বর শুনে তাকিয়ে আছে। তাই পূর্ণা চুপসে গেল। আস্তে আস্তে বলল,'এতো দেরিতে আসলেন কেন? আপার তো বিয়ে। আপনি আপাকে নিয়ে পালিয়ে যান।'
পূর্ণার এহেন কথায় লিখন হাসে। আদুরে কণ্ঠে জানতে চাইল,'আন্টি কোথায়?'
পূর্ণা ঝটপট করে বলল,'আপনি আসুন ঘরে। আমি আম্মাকে নিয়ে আসছি।'

লিখনকে সদর ঘরে বসিয়ে পূর্ণা ছুটে গেল রান্নাঘরে। হেমলতা রান্না করছিলেন। পাশে অনেকে আছে। পূর্ণা ইশারায় বাইরে আসতে বলে। হেমলতা হাত ধুয়ে বেরিয়ে আসেন। পূর্ণা ফিসফিসিয়ে বলে,'লিখন ভাই আসছে।'
'কোথায়? বসতে দিয়েছিস?'
'হ্যাঁ, দিছি। তুমি আসো।'

হেমলতা ব্যস্ত পায়ে হেঁটে সদর ঘরে আসেন। এসে দেখেন দুজন বয়স্ক মহিলা অনবরত লিখনকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে। সে কই থেকে এসেছে? এই বাড়ির কী হয়? পদ্মজার মতো চোখ কেন? পদ্মজার আসল বাপের ছেলে নাকি। এমন আরো যুক্তিহীন কথাবার্তা। হেমলতা সবাইকে উপেক্ষা করে লিখনকে বললেন,'লিখন তুমি আমার সাথে আমার ঘরে আসো।'

লিখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। হেমলতার পিছু পিছু চলে যায়। অনেকের নজরে তা আসে। একজন আরেকজনকের সাথে আলোচনা করতে থাকে লিখন শাহকে নিয়ে। সবাই ভেবে নিয়েছে পদ্মজা যার সন্তান এই ছেলেও তার সন্তান। এজন্যই সবার মাঝ থেকে তুলে নিয়েছে। নয়তো তো কথায় কথায় ধরা পড়ে যাবে। লিখনকে মোড়ায় বসতে দিলেন হেমলতা। লিখন কীভাবে কী শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। হেমলতা শুরু করলেন,'আমি জানি তুমি কী বলবে। তোমার দুইটা চিঠি আমি পড়েছি।'

লিখন চমকে তাকাল। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। হেমলতা বলেন,'দেখো লিখন,পরিস্থিতি আর হাতে নেই। অন্য সময় হলে আমি পদ্মজাকে তোমার হাতে তুলে দিতাম। তুমি নম্র-ভদ্র বুদ্ধিমান ছেলে। কমতি নেই কিছুতেই। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। তবুও পদ্মজা তোমাকে নিজের মুখে যদি চায় আমি তাৎক্ষণিক তাকে তোমার হাতে তুলে দেব। কিন্তু সে চাইবে না। কারণ,সে তোমাকে ভালোবাসে না। আমার কথাগুলো শুনে কষ্ট পেয়ো না। আমি সরাসরি কথা বলি। পদ্মজার দৃষ্টি,অনুভূতি আমার চেনা। সে তোমাকে ভালোবাসেনি কখনো। তোমার মন ভাঙবে ভেবে মায়া হচ্ছে। কষ্ট পাচ্ছে। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কষ্ট হবে ভেবেই বলছি ফিরে যাও।'

লিখন কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকে। চোখের দৃষ্টি রাখা মাটিতে। বলল,'আন্টি মেয়ের ভালোবাসা দেখছেন, অন্যের সন্তানেরটা দেখবেন না?'
'অন্যের অনেক সন্তানই আমার মেয়েকে ভালবাসে। সবার কথা ভাবা কী সম্ভব?'

হেমলতার কথায় ভীষণ আহত হয় লিখন। তার মনে হচ্ছে সে কঠিন পাথরের সাথে কথা বলছে। দুই চোখ জ্বলছে ভীষণ। এখুনি কান্নারা ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসবে। ছেলে হয়ে কাঁদা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। লিখন নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। হেমলতা কঠিন স্বরে বললেন,'তুমি পদ্মজার রূপের প্রেমে পড়েছো লিখন।'

লিখন সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকায়। বলে,'আন্টি ক্ষমা করবেন কিছু কথা বলি। পৃথিবীতে যে কয়টা সফল প্রেমের গল্প আছে তার মধ্যে ৯৯ ভাগ সৌন্দর্যের টান দিয়ে শুরু হয়। এরপর আস্তে আস্তে ভালোবাসা গভীর হয়। মানুষটাকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে,মানুষটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে গিয়ে ভালোবাসাটা আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। সময়ের ব্যবধানে সে মানুষটা শিরা উপশিরায় বিরাজ শুরু করে। তখন তার অন্যান্য গুণ চোখে ভাসে। ভালবাসা আরো বাড়ে। কারো কারো তো দোষও ভালো লেগে যায়। তখন অবস্থা এরকম হয় যে, রূপ নষ্ট হয়ে গেলেও মানুষটাকে আমার চাই। এজন্যই বুড়ো বয়সেও কুঁচকে যাওয়া মানুষটাকেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। অথচ শুরুটা হয় সৌন্দর্য দিয়ে। আন্টি,আমি পদ্মজার রূপে মুগ্ধ হয়ে ছিলাম এটা সত্যি। কিন্তু গত কয়েক মাসে সারাক্ষণ পদ্মজাকে ভাবতে গিয়ে আমি সত্যি সত্যি পদ্মজাকে ভালোবেসে ফেলেছি। পদ্মজার রূপ আগুনে ঝলসে গেলেও এমন করেই বাসবো। প্লীজ আন্টি কথাগুলো শুটিংয়ের ডায়লগ ভেবে উড়িয়ে দিবেন না। বাস্তব জীবনে মুখস্থ ডায়লগ আমি আওড়াই না।'

লিখনের কণ্ঠ গম্ভীর কিন্তু চোখে জল ছলছল করছে। হেমলতা স্তব্ধ হয়ে যান। কী জবাব দিবেন? ভালোবাসার বিরুদ্ধে কোন শক্তি কাজে লাগে? আদৌ কী ভালবাসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়? তিনি সময় নেন। এরপর বলেন,'আমার পদ্মজা তোমার কাছে খুব ভাল থাকতো লিখন। কিন্তু কিছু সমস্যা সমাজে আছে। যার মুখোমুখি আমি হয়েছি। জেনেশুনে আমার মেয়েকে সেসবের মুখোমুখি কি করে হতে দেই?'

লিখন হাতজোড় করে বলল,'প্লীজ আন্টি!'

হেমলতা একদৃষ্টে লিখনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। এমন তো কখনো হয় না। পদ্মজার জন্মের পর সিদ্ধান্তহীনতায় তিনি কখনো ভুগেননি। যেকোনো একটাই বেছে নিয়েছেন। আর তাতেই মঙ্গল হয়েছে। এবার কেন এমন হচ্ছে? কেন তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছেন। পদ্মজার জীবন নিয়ে তিনি যেন মাঝ নদীতে ভেসে আছেন। চারদিকে স্রোত। মাঝি নেই,বৈঠা নেই। আমির না লিখন? কার কাছে ভাল থাকবে পদ্মজা? হেমলতার শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে। তিনি দূর্বল কণ্ঠে বলেন,'এতো বুঝো যখন নিজেকেও সামলাতে পারবে। বাড়ি ফিরে যাও।'
'আন্টি,আমার বেঁচে থাকতে কষ্ট হবে।'
'পদ্মজার সাথে যা হয়েছে তবুও সে বেঁচে আছে। আর তুমি এইটুকু মানিয়ে নিতে পারবে না?'

লিখন আর কথা খুঁজে পেল না। আহত মন নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হেমলতা দাঁড়াতে বললেন। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, তবুও হেঁটে এগিয়ে আসেন। লিখনের সামনে এসে দাঁড়ান। বললেন,'নিজেকে শক্ত

রেখো। অনেক দূর চলা বাকি। কারো জন্য কারো জীবন থেমে থাকে না। ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়। সব যেহেতু আয়োজন হয়ে গেছে আর ভেবে লাভ নেই। তবে, কবুল বলার আগেও যদি পদ্মজা বলে, তার তোমাকেই চাই। আমি সব ভেঙেচুরে পদ্মজাকে নিয়ে ছুটে যাব তোমার বাড়ি। আমি আমার মেয়েটাকে ভীষণ ভালোবাসি বাবা। এই মেয়েটার সুখের জন্য আমি স্বার্থপর হয়েছি। অন্যের সন্তানের কষ্ট চোখে ভেসেও, ভাসছে না। আমাকে ক্ষমা করে দিও।'

হেমলতার চোখে জলের ভীর। লিখন ভীষণ অবাক হয়ে দেখে এই কঠিন মানুষটাকে। হেমলতা নিজের দূর্বলতা, নিজের কান্না কেন দেখাল লিখনকে? লিখন জবাব খুঁজে পেল না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারল হেমলতার কাছে জীবন মানে পদ্মজা। লিখন ভাঙা গলায় 'আসি' বলে চলে গেল। হেমলতা সব কাজ ভুলে গুটিসুটি মেরে বিছানায় শুয়ে পড়েন। চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল বেরিয়ে আসে। মনের শক্তি কমে গেছে। দূর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। নিজের উপর বিশ্বাস, আস্থা পাচ্ছেন না। সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা খুঁজে পাচ্ছেন না।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ২৪

____
বারান্দার গ্রিলে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে পদ্মজা।
তার পরনে শাড়ি রয়ে গেছে। আকাশের বুকে থালার মতো একখান চাঁদ। চাঁদের আলোয় চারদিক ঝিকমিক করছে। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। খুব সুন্দর দৃশ্য।

'পদ্ম...'

পদ্মজা কেঁপে উঠে,পিছনে ফিরে তাকাল। মোর্শেদকে দেখতে পেয়ে গোপনে হাঁফ ছাড়ল ।
মোর্শেদ বললেন,'তোর মায়ে কী আর উঠে নাই?'
'না,আব্বা।'
মোর্শেদ চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছু ভাবলেন। তারপর বলেন,'তুই হজাগ ক্যান? যা ঘরে গিয়া ঘুমা। আমি ঘাটে যাইতাছি।'
'আচ্ছা,আব্বা।'

মোর্শেদের যাওয়ার পানে পদ্মজা তাকিয়ে রইল। সে কী যেন ভাবছে কিন্তু কী ভাবছে ধরতে পারছে না। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে উদাসীনতা কেটে গেল। শাড়ির আঁচল টেনে সাবধানে হেঁটে সদর ঘরে ঢুকল। সদর ঘরে পাটি বিছিয়ে দূর দূরান্ত থেকে আসা আত্মীয়রা ঘুমাচ্ছে। তাদের ডিঙিয়ে পদ্মজা হেমলতার ঘরে আসে। হেমলতা ঘুমাচ্ছেন বেঘোরে। শুনেছিল,লিখন শাহ কে নিয়ে তার মা নিজ ঘরে এসেছিলেন। এরপর কী হলো কে জানে! সন্ধ্যার পর পূর্ণা গিয়ে জানাল,আম্মা ঘুমাচ্ছে। হেমলতা কখনো সন্ধ্যা সময় ঘুমান না। তাই পদ্মজা ঘোমটা টেনে হেমলতার ঘরে ছুটে আসে। হেমলতাকে এত শান্তিতে ঘুমাতে কখনো দেখেনি পদ্মজা। তাই আর

ডাকেনি। কেউ ডাকতে আসলে, তাড়িয়ে দিয়েছে। ঘুমাচ্ছে যখন ঘুমাক না। এখন মধ্য রাত।
পদ্মজা হেমলতার মুখের সামনে মাটিতে বসে।
একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। গলা কাঁপছে তার। শ্বশুর বাড়ি কীভাবে থাকবে সে! মাকে ছাড়া দুইদিন থাকতে গিয়ে এতো বড় ঝড় বয়ে গেল। আর এখন সারাজীবনের জন্য মায়ের ছায়া ছেড়ে দিতে হবে। এই মুখটা না দেখলে তার দিন কাটে না। এই মানুষটার আদুরে,শাসন ছাড়া দিন সম্পূর্ণ হয় না। পদ্মজা বিছানায় মাথা ঠুকে ফুঁপিয়ে উঠল। অস্ফুট করে ডাকল,'আম্মা।'

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা চোখ খুলেন। পদ্মজা খেয়াল করল না। সে কাঁদতে কাঁদতে চাপা স্বরে বলছে,'তোমাকে ছাড়া কেমনে থাকব আম্মা! বিয়ে করাটা কী খুব দরকার ছিল।'
'ছিল।'
পদ্মজা চমকে উঠে মাথা তুলল। গলার স্বর আগের অবস্থানে রেখে বলল,'কেন আম্মা?'
'সব জানতে নেই মা।'

পদ্মজা মাথা নত করে নাক টানে। হেমলতা বললেন,'বিয়ে হতেই হবে। বর বদল হলে সমস্যা নেই। তোর কী আর কাউকে পছন্দ?'

হেমলতার প্রশ্নে পদ্মজা বিব্রত হয়ে উঠল। হেমলতাও প্রশ্নটা করতে গিয়ে অস্বস্থি বোধ করেন। পদ্মজা মাথা দুই পাশে নাড়িয়ে জানাল, তার আলাদা করে কাউকে পছন্দ নেই। হেমলতা উঠে বসেন। চুল খোঁপা করতে করতে প্রশ্ন করেন,'রাত কী খুব হয়েছে? মানুষের সাড়া নেই।'
'মাঝ রাত।'
'আর তুই জেগে থেকে কাঁদছিস?' হেমলতা বললেন। মৃদু ধমকের স্বরে।

পদ্মজা নিরুত্তর। হেমলতা জানালার বাইরে চেয়ে দেখলেন,চাঁদের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল। চাঁদের আলো গলে ঘরের মেঝেতে পড়ছে। জ্যোৎস্না রাত। তিনি বিছানা থেকে নামতে নামতে পদ্মজাকে তাড়া দেন,'শাড়ি পাল্টে সালোয়ার-কামিজ পরে নে।'
'কেন আম্মা?'
'যা বলছি কর।'
পদ্মজা ঘরে গিয়ে শাড়ি পাল্টে নিল। উঠানে এসে দেখে,হেমলতার হাতে বৈঠা। পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,'আম্মা,তুমি নৌকা চালাবা?'
'পূর্ণারে নেব? নেওয়া উচিত। যা ওকে ডেকে নিয়ে আয়। প্রান্ত,প্রেমা যেন টের না পায়।'
পদ্মজা অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। হেমলতা তাড়া দেন,'যাবি তো।'
পদ্মজা হন্তদন্ত হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পূর্ণাকে নিয়ে ফিরল। পূর্ণা ঘুমে ঢুলছে। হেমলতা ঘাটে এসে দেখেন মোর্শেদ নৌকায় বসে বিড়ি ফুঁকছেন।
'নৌকা ছাড়ো।'

মোর্শেদ দুই মেয়ে আর বউকে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছেন। তার মধ্যে হেমলতা যেভাবে বললেন,নৌকা ছাড়ো, আরো ভড়কে গেলেন। চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করলেন,'ক্যান? কিতা অইছে?'

মোর্শেদের জবাব না দিয়ে পদ্মজা,পূর্ণাকে নিয়ে হেমলতা নৌকায় উঠে পড়েন। স্থির হয়ে বসেন। বৈঠা মোর্শেদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলেন,'জ্যোৎস্না রাতের নৌকা ভ্রমণে বের হয়েছি আমরা। তুমি এখন আমাদের মাঝি।'

হেমলতা থামেন। এরপর আঞ্চলিক ভাষায় বললেন,'লও মাঝি বৈঠা লও। ছাড়ো তোমার নৌকা। যত সিকি চাইবা তুমি ততই পাইবা।'

একসাথে চারটা দুঃখী মানুষ হেসে উঠে। মোর্শেদ বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকা ছাড়েন। হুট করেই যেন অনুভব করছেন, যুবক কালের রক্ত শরীরে টগবগ করছে। এইতো তার সংসার, এইতো তার আনন্দ।

রাতের নির্মল বাতাস। মাদিনী নদীর স্বচ্ছ জলে চাঁদের প্রতিচ্ছবি। কচুরিপানারা ভেসে যাচ্ছে। সবকিছু সুন্দর মুগ্ধকর। পূর্ণার বুকের ভারটা খুব হালকা লাগছে। পদ্মজা প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। রগে রগে শান্তি ঢুকে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা যেন প্রকৃতির সৌন্দর্যে যেকোনো দুঃখী মানুষকে সুখী অনুভব করানোর মন্ত্র ঢেলে দিয়েছেন।

'মোর্শেদ নাকি গো?'
হিন্দুপাড়া থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে ডাকল। মোর্শেদ এক হাত তুলে জবাব দিলেন,'হ দাদা আমি।'
'রাইতের বেলা যাইতাছ কই?'
'মেয়ে-বউ লইয়া জ্যোৎস্না পোহাইতে বাইর হইছি দাদা।'
'তোমাদেরই দিন মিয়া।'

মোর্শেদ আর কিছু বললেন না। হাসলেন। ওপাশ থেকেও আর কারো কথা শোনা গেল না। নৌকা আটপাড়া ছেড়ে হাওড়ে ঢুকে পড়েছে। সাঁ,সাঁ করে বাতাস বইছে। গায়ের কাপড় উড়ছে। হেমলতা দুই মেয়ের মাঝে এসে বসেন। তিনি চাদর নিয়ে এসেছেন। দুই মেয়েকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে চাদরে ঢেকে দেন। বাতাসে চাদর উড়ে আরো আওয়াজ তুলছে। চাঁদটা একদম মাথার উপর। তাদের সাথে সাথে ঘুরছে! মোর্শেদ মনের সুখে গান ধরেন-

লোকে বলে বলেরে
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূণ্যেরও মাঝার।।
ভালা কইরা ঘর বানাইয়া
কয়দিন থাকমু আর
আমি কয়দিন থাকমু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি
পাকনা চুল আমার।
লোকে বলে ও বলেরে
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার।।

পাকনা চুল আমার বলতেই পূর্ণা ফিক করে হেসে ফেলল। পদ্মজাকে ফিসফিসিয়ে বলল,'আব্বা বোধহয় এখনো জোয়ান থাকতে চায়।'

পদ্মজা হেসে চাপা স্বরে বলে,'চুপ থাক। আব্বা কী সুন্দর গায়।'
মোর্শেদ গেয়ে যাচ্ছেন-

এ ভাবিয়া হাসন রাজা
হায়রে,ঘর-দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখব আল্লায়
কোথায় নিয়া রাখব আল্লায়
তাই ভাবিয়া কান্দে।।
লোকে বলে ও বলেরে
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার।।

জানত যদি হাসন রাজা
হায়রে,বাঁচব কতদিন
বানাইত দালান-কোঠা
করিয়া রঙিন।।
লোকে বলে ও বলেরে
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার।।

মোর্শেদ থামেন। তিন মা-মেয়ে একসাথে হাতের তালি দিল। হাতের তালিতে চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠল। এতো সুন্দর সময়! এতো সুন্দর রাত বার বার ফিরে আসুক। মোর্শেদ হা করে তাকিয়ে থাকেন সামনে থাকা তিনটা মানুষের দিকে। তাদের চোখেমুখে খুশি ঝিলিক মারছে। অথচ,তিনি জানেন একেকজন কতোটা দুঃখী। মোর্শেদ ঢোক গিলে লুকায়িত এক সত্যের কষ্ট লুকিয়ে যান। হেমলতা আর তিনি ছাড়া এই কলিজা ছেঁড়া কষ্ট কেউ জানে না। মোর্শেদ হেসে বললেন,
'এই অভাগা মাঝিরে কী আপনারা আপনাদের মাঝে জায়গা দিবেন?'

মোর্শেদের কণ্ঠে শুদ্ধ ভাষায় মিষ্টি আবদার শুনে পদ্মজা পুলকিত হয়ে উঠল। ইশ! আজ সব কিছু কত সুন্দর! পূর্ণা বলে,'দেব। এক শর্তে, নৌকা চালানোর বিনিময়ে সিকি যদি না নেন।'

মোর্শেদ মেয়ের রসিকতা দেখে হা হা করে হাসেন। সেই হাসি বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে কানে। তিনি বৈঠা রেখে এগিয়ে আসেন। হেমলতার সামনে বসেন। নৌকা নিজের মতো যেদিকে ইচ্ছে ছুটে চলছে। মোর্শেদ হেমলতাকে বলেন,'দুইডা ছেড়িরে খালি তুমি ধইরা রাখবা? ছাড়তো এইবার। আয়রে তোরা আমারে ধারে আইয়া ব।'

পদ্মজা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকায়। হেমলতা যেতে বলেন। পদ্মজা মোর্শেদের ডান পাশে বসে,আর পূর্ণা বাম পাশে। মোর্শেদ পূর্ণাকে এক হাতে, পদ্মজাকে আরেক হাতে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে উঠেন। অপরাধী স্বরে বলেন,'আমি বাপ হইয়া পারি নাই আমার ছেড়িদের বেইজ্জতির হাত থাইকা রক্ষা করতে। আমারে মাফ কইরা দিস তোরা।'

Kobitor.com

মোর্শেদ কখনো এতো আদর করে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরেননি। এই প্রথম ধরেছেন। আবার কাঁদছেন। পদ্মজার কোমল,নরম মন ব্যথিত হয়ে চোখ বেয়ে জল রূপে বেরিয়ে আসে। হেমলতা মোর্শেদের পায়ের কাছে বসেন। মোর্শেদের হাঁটুতে মাথা রেখে, দুই মেয়ের হাত চেপে ধরে রাখেন। কেটে যায় অনেক মুহূর্ত। নৌকা হাওড়ের পানির স্রোতে একবার এদিক তো আরেকবার ওদিক যাচ্ছে। বাতাসে চার জনের চোখের জল শুকিয়ে ত্বকের সাথে মিশে গেছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে পদ্মজা বলল,'জানো আম্মা, আজ আমি বুঝলাম, জীবনে সুখ বা দুঃখ কোনোটাই চিরস্থায়ী নয়। দুঃখে মর্মাহত না হয়ে সুখের সময়টা তৈরি করে নিতে হয়। তাহলেই জীবনে সুখকর মুহূর্ত আসে। আবার সুখ সর্বক্ষণ সাথে থাকে না। দুনিয়ার লীলাখেলার শর্তে দুঃখ বার বার ফিরে আসে।'

হেমলতা পদ্মজার দিকে না তাকিয়ে,পদ্মজার ডান হাতে চুমু দেন। চাঁদটা অর্ধেক হয়ে এসেছে। খুব তাড়াতাড়ি আকাশে মিলিয়ে যাবে।

চলবে....
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ২৫

_____

হাওরে বিশাল জলরাশি। কখনো ঢেউয়ে উথাল-পাতাল, আবার কখনো মৃদু বাতাসে জলের ওপর চাঁদের প্রতিচ্ছবির খেলা। নৌকা বাজারের দিকে যাওয়ার পথ ধরেছে। তাই মোর্শেদ নিস্তব্ধ বৈঠক ভেঙে বৈঠা নিয়ে বসেন। নৌকা নিয়ন্ত্রণে এনে রাধাপুর হাওড়ের দিকে যেতে থাকেন। ওড়নার ঘোমটার আড়ালে কখন খোঁপা খুলে গেছে পদ্মজা খেয়াল করেনি। হেমলতা খেয়াল করেন পদ্মজার চুল হাওড়ের জলে ডুবে আছে। তিনি মৃদু স্বরে পদ্মজাকে বললেন,'চুল ভিজে যাচ্ছে পদ্ম।'

পদ্মজা দ্রুত সামলে নিল। খোঁপা করে ঘোমটা টেনে নিয়ে বলল,'কখন খুলে গেছে খেয়াল করিনি।'

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। হেমলতা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন এক মনে। পদ্মজা ডাকল,'আম্মা?'

হেমলতা অশ্রুভরা চোখে তাকালেন। পদ্মজা কিছু বলার আগে তিনি বললেন,'পূর্ণা গল্প শুনবি?'

পূর্ণা গল্প বলতে পাগল। সে গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। খুশিতে বাকবাকুম হয়ে বলল,'শুনব।'
'কষ্টের গল্প কিন্তু।'
'গল্প হলেই হলো।'

হেমলতা হাসেন। পদ্মজা নড়েচড়ে বসে। সে আন্দাজ করতে পারছে তার মা কোন গল্প বলবে। হেমলতা দু'হাতে জল নিয়ে মুখ ধুয়ে নেন। এরপর একবার মোর্শেদের দিকে তাকিয়ে হাসেন। পিছন ঘুরে বসে প্রশ্ন করেন,'মুখ না দেখে গল্প শুনতে ভাল লাগবে?'

পূর্ণা মুখ গোমড়া করে না বলতে যাচ্ছিল। পদ্মজা এক হাতে খপ করে ধরে আটকে দিল। মাকে বলল,'সমস্যা নেই আম্মা। যেভাবে ইচ্ছে বলো।'

হেমলতা বড় করে দম নিয়ে বলা শুরু করলেন,'আব্বার প্রথম স্ত্রী মারা যায় অল্প বয়সে। আব্বা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। একজন বুদ্ধিমান, উদার মনের মানুষ ছিলেন। আম্মাকে যৌতুকের জন্য ধাক্কা মেরে বের করে দিল তার প্রথম স্বামী। মুখে তালাক দিল। বাপের সংসারে এসে সমাজের তোপে পড়তে হয় আম্মাকে। আব্বার উদার মন অবলা,অসহায় আম্মাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন।তিনি আমার নানার কাছে প্রস্তাব রাখেন। নানা সানন্দে রাজি হয়ে যান। রাজি হবেনই না কেন? স্বামীর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া বিবাহিত নারীকে কে ই বা বিয়ে করতে চায়? আম্মা,আব্বার বিয়ের বছর দেড়েক হতেই হানি আপার আগমন। তার দুই বছরের মাথায় আমার আগমন ঘটে।'

'সেদিন নিশ্চয় গাছে গাছে ফুল ফুটেছে।' পদ্মজা বলল,পুলকিত হয়ে।

হেমলতা ম্লান হাসেন। বলেন,'শুনেছি আমার গায়ের রং দেখে আম্মা নাক কুঁচকেছিলেন। আমার বয়স যখন তিন মাস আম্মার আগের স্বামী আম্মাকে ফিরিয়ে নিতে আসে। আব্বার তখন আর্থিক সমস্যা বেশি ছিল। দিনে দুই বেলা খাওয়া সম্ভব ছিল না। বিপদে পাশে থাকা আমার আব্বাকে ছেড়ে,দুই বছরের এক মেয়ে আর তিন মাসের এক মেয়েকে ছেড়ে স্বার্থপর মা পালিয়ে গেল প্রথম স্বামীর কাছে। আব্বা ছোট ছোট দুই মেয়েকে নিয়ে মাঝ নদীতে পড়েন। কিন্তু আল্লাহ সহায় ছিলেন। আব্বার ফুফু চলে আসেন আমাদের কাছে। আপা আর আমার দায়িত্ব নেন। হুট করেই আব্বার আর্থিক অবস্থা উন্নত হতে থাকে। গৃহস্থিতে রহমত ঝরে পড়ে। পাঁচ বছর পর আম্মা ফিরে আসেন। বিধ্বস্ত অবস্থা। ফর্সা মুখ মারের চোটে দাগে দাগে বিশ্রি হয়ে গেছে। শুধু একা আসেনি। দুই বছরের এক ছেলে নিয়ে ফিরেন। তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরের বদলে বিশাল বাড়ি হয়েছে। আব্বা প্রথম মানেননি। আম্মা আব্বার পায়ে পড়ে কাঁদেন। ক্ষমা চান। আব্বা আবার আগের ভুল করেন। মেনে নেন আম্মাকে। আম্মার ছেলের নাম বিনোধ ছিল, আব্বা নতুন নাম দেন হানিফ। আম্মা আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। আব্বার চোখের মণি ছিলাম। আব্বার আড়ালে আম্মার দ্বারা নির্যাতিত হতে থাকি। ছয় বছর হতেই স্কুলে ভর্তি করে দেন আব্বা। হানি আপা তখন স্কুলে পড়ে। আমি..."

'থামলে কেন আম্মা?' বলল পদ্মজা,অধৈর্য্য হয়ে।

হেমলতা ভ্রুকুটি করে বলেন,'আর বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না আম্মার ব্যাপারে। আম্মা অনুতপ্ত এখন। আফসোস করেন। কাঁদেন। বলতে ভাল লাগছে না।'

শীতল বাতাসে সবার শরীর কাঁটা দিচ্ছে। চাঁদটা ছোট হয়ে গেছে অনেক। মোর্শেদ এক ধ্যানে বৈঠা দিয়ে জল ঠেলে দিচ্ছেন দূরে নৌকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে। হেমলতা আবার বলতে শুরু করেন,'মেট্রিক দেয়ার পর আম্মা পড়াতে চাইছিল না। আব্বার জন্য ঢাকার কলেজে পড়ার সুযোগ পাই। হোটেলে উঠি। আব্বা নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। জানিস পদ্ম, কলেজে আমি সবার ছোট ছিলাম। সবাই হা করে তাকিয়ে থাকতো। শাড়ি পরতাম বলে একটু বড় লাগতো অবশ্য। সবসময় সুতি শাড়ি পরে বেণী বেঁধে রাখতাম। কারো সাথে মিশতাম না। ভয় পেতাম খুব। ভীষণ ভীতু ছিলাম। রিমঝিম নামে খ্রিষ্টান এক মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয়। মেয়েটা এতো সুন্দর ছিল

দেখতে। ঠিক পদ্মজার মতো সুন্দর। চোখের মণি ছিল ঘোলা। তার নাকি শ্যামলা মানুষ ভাল লাগে তাই নিজে যেচে আমার সাথে বন্ধুত্ব করে। কয়েকদিনের ব্যবধানে আমরা খুব ঘণিষ্ঠ হয়ে পড়ি। ইংলিশে যাকে বলে,বেস্ট ফ্রেন্ড। রিমঝিমের সাথে মাঝে মাঝে ওর বড় ভাই আসতো। নাম ছিল যিশু। যিশু একদম রিমঝিমের আরেক রূপ।চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য ছিল দুই ভাই-বোনের। যিশু ভাইয়া বলে ডাকতাম তাকে। যিশু ভাইয়া মজা করে বলতেন,'ধর্ম এক হলে হেমলতাকেই বিয়ে করতাম।' পূর্ণা,পদ্মজা খারাপ লাগছে শুনতে?'

'না আম্মা।' এক স্বরে বলল দুজন। পদ্মজা বলল,'পরে কী হয়েছে আম্মা?'

'তখন অলন্দপুর থেকে দুই সপ্তাহ লাগতো রাজধানীতে চিঠি পৌঁছাতে। কলেজ ছুটির পথে হানি আপার চিঠি পাই। পাশে রিমঝিম ছিল। যিশু ভাইয়া সবেমাত্র এসেছেন রিমঝিমকে নিয়ে যেতে। চিঠি পড়ে জানতে পারি,আব্বা হাওড়ে গিয়েছিলেন মাছ ধরতে। আব্বার পাশের নৌকায় সুজন নামে এক ছেলে ছিল। আব্বার নৌকায় চেয়ে কয়েক হাত দূরে। তখন ভারী বর্ষণ হচ্ছিল। বজ্রপাত হচ্ছিল একটার পর একটা। একটা বজ্রপাত সুজনের উপর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সুজন ঝলসে যায়। আব্বা ছিটকে পড়েন জলে। দূর থেকে এক দল জেলে ঘটনাটি দেখতে পায়। তারা আব্বাকে তুলে নিয়ে যায় বাড়িতে। এরপর থেকেই আব্বা কানে শুনতে পায় না। ঠিক করে হাঁটতে পারে না। মস্তিষ্ক অচল হয়ে পড়ে। এই খবর শোনার পর হাউমাউ করে কান্না শুরু করি। যিশু ভাই সব শুনে,আমার কান্না দেখে বলেন,বিকেলের ট্রেনে অলন্দপুর নিয়ে যাবেন। আমি তখনও কাঁদছিলাম। একবার শুধু অলন্দপুর যেতে চাই। আব্বাকে দেখতে চাই। যদিও জানতাম,অনেকদিন হয়ে গেছে এই দূর্ঘটনার।
আটপাড়া পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যায়। বাড়ি এসে দেখি সদর ঘরের দরজায় তালা মারা। কেউ নেই বাড়িতে। মুরগি আর গরু-ছাগল ছাড়া। বারান্দার ঘরে দরজা ছিল না। ঘরও বলা যায় না। শুধু একটা চৌকি ছিল। বড্ড ক্লান্ত ছিলাম। চৌকিতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙে আম্মার চেঁচামেচিতে। যিশু ভাই নিজের অজান্তে আমার পাশে কখন ঘুমিয়ে পড়েন বুঝেননি। তিনি আমার মতোই ক্লান্ত ছিলেন। আমার জন্মদাত্রী মা গ্রামবাসী ডেকে চেঁচাতে থাকেন। হাতেনাতে ধরার মতো অবস্থা ছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে ভড়কে যাই। কিছু বলতে পারিনি। যিশু ভাই সবাইকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করে, কেউ বুঝেনি। তখন নিয়ম খুব কঠিন ছিল। যিশু ভাই খ্রিষ্টান শুনে সবাই আরো ক্ষেপে যায়। আব্বার সামনে আমাদের দুজনের মাথা ন্যাড়া করে দিল গ্রামবাসী। কোমর সমান চুল ছিল আমার। মাথা ন্যাড়া করতে গিয়ে মাথার চামড়া ছিঁড়ে ফেলে। রক্ত আসে গলগল করে। আম্মার তখন হুঁশ আসে। আমাকে বাঁচাতে আসে,পারেনি। গায়ের রং কালো তার উপর রক্তাক্ত ন্যাড়া মাথা। কী যে বিশ্রি রূপ হয়েছিল। আমি আমার একমাত্র ভরসা আব্বাকে চিৎকার করে ডেকে কেঁদেছি। আব্বা শুনেনি। আমার দিকে হা করে শুধু তাকিয়েছিল। যিশু ভাইয়াকে অনেক মারধর করে। সেদিন রাতেই আহত যিশু ভাইয়াকে ছুঁড়ে ফেলে আসে নদীর পাড়ে। গরুর ঘরে গোবরের উপর বেঁধে রাখে আমাকে। দূরদূরান্তরের মানুষ দেখতে আসে। আমি তখন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নিজের মৃত্যু কামনা করেছি। একবার বাঁধনছাড়া হলে আত্মহত্যা করব ভাবি। হাত বাঁধা ছিল। দাঁত দিয়ে নিজের হাঁটুতে বোকার মতো কামড় দিতে থাকি একটার পর একটা, যাতে মরে যাই। যে ই দেখতে আসতো সেই বিশ্রি গালি দিয়ে যেত। কেউ কেউ লাথি দিয়েছে। রাধাপুরের হারুন রশীদ আছে না? উনার আব্বা তখন অলন্দপুরের মাতব্বর ছিলেন। উনার গোয়ালঘরেই বন্দি ছিলাম।।দুই দিন পর আমাকে ছাড়ে। ছাড়া পেয়েই ইচ্ছে হচ্ছিল, গলায় কলসি বেঁধে ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেই। কিন্তু পারিনি। শরীরে একটুও শক্তি ছিল না। দৌড়ে

পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি গোয়ালঘরের বাইরে। ধারালো কিছু একটা ছিল মাটিতে। মাটিতে পড়তেই হাতের বাহু ছিঁড়ে গলগল রক্তের ধারা নামে। এই যে আমার বাহুর দাগটা। এটা সেদিনই হয়েছে।'

হেমলতা মেয়েদের দাগটা দেখানোর জন্য ঘুরে তাকান। দেখেন তার দুই মেয়ে মুখে হাত চেপে কাঁদছে। হেমলতা হাসার চেষ্টা করে বললেন,'তোরা মরাকান্না শুরু করেছিস কেন?'

হেমলতার কথা শেষ হতেই ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুই মেয়ে ছুটে আসে তার দিকে। নৌকা দুলে উঠে। হেমলতা চমকে গিয়ে দ্রুত নৌকা ধরেন। চিৎকার করে উঠেন,'আরে...'

কথা শেষ করতে পারেননি। তার পূর্বেই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই মেয়ে। জড়িয়ে ধরেই আম্মা আম্মা বলে কাঁদতে থাকে। দুই মেয়ে এতো শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে যে,হেমলতার মনে হচ্ছে এখুনি দম বেরিয়ে যাবে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। হেমলতা দুজনের পিঠে হাত বুলিয়ে স্বান্তনা দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তারা কেঁদে চলেছে। হেমলতা মোর্শেদের উদ্দেশ্যে বলেন,'নৌকা ঘুরাও। এদের আর কিছু বলব না। আর ঘুরব না।'

পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকে বলল,'আর কাঁদব না। পূর্ণা আর কাঁদিস না। কিন্তু তোমাকে জড়িয়ে রাখব।'

হেমলতা পদ্মজার মাথায় চুমু দিয়ে বললেন,'আমাদের এক ঘরে করে দেওয়া হলো। বাজারে ভেষজ উপায়ে আব্বার চিকিৎসা চলছিল। সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। কেউ আমার পরিবারের মুখও দেখতে চায় না। দেখলেই এটা ওটা ছুঁড়ে দিত। বলা হয়নি,সেদিন রাতে আব্বা,আম্মা,হানিফ মামার বাড়ি ছিল। মামার বাড়ির পাশের বাড়িতে ডাক্তার ছিল একজন। আব্বাকে দেখাতে গিয়েছিল। হানি আপার বিয়ে দেয়ার জন্য আম্মা উঠেপড়ে লাগে। তখন হিমেল আম্মার পেটে। সাত মাস চলে। আমার উপর আম্মার মার প্রতিদিন চলতেই থাকে। আমার জন্য পরিবারের এতো ক্ষতি হলো। হানিফ স্কুলে যেতে পারে না। সবাই দূর দূর করে। হানি আপার বিয়ে হয় না। আব্বার চিকিৎসা হয় না। বিপদ-আপদে কেউ পাশে আসে না। ওদিকে হিমেল আসার সময় ঘনিয়ে আসছে। কোনো দাত্রী আসেনি। আম্মা একা যুদ্ধ করে হিমেলকে জন্ম দিল। সব মিলিয়ে জীবনটা নরক হয়ে উঠে আমার। বছর দুয়েকের মধ্যে আব্বা কিছুটা সুস্থ হয় আল্লাহর রহমতে। হাঁটাচলা করতে পারেন। আগের মতো সবকিছু না বুঝলেও মোটামুটি বুঝতেন। হানি আপার বিয়ে ঠিক হলো। বনেদি ঘর থেকে প্রস্তাব আসে। শর্ত পাঁচ বিঘা জমি দিতে হবে। আমাদের জমি ছিল সাড়ে পাঁচ বিঘা। আম্মা পাঁচ বিঘা জমি দিয়েই হানি আপার বিয়ে দিলেন। সবকিছু স্বাভাবিক হয়। যদিও মাঝে মাঝে অনেকে কথা শুনিয়েছে। একসময় আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে। তোদের আব্বার সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে জানতে পারি তোদের আব্বার দ্বিতীয় স্ত্রী আমি।'

শেষ কথাটা হেমলতা মোর্শেদের দিকে তাকিয়ে বলেন। মোর্শেদ চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নত হন। পূর্ণা খুব অবাক হয়ে মোর্শেদের দিকে তাকাল। হেমলতা পূর্ণাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলেন,'আব্বাকে ভুল বুঝিস না মা। ভালোবাসার উপর কিছু নেই। ভালোবেসে লুকিয়ে বিয়ে করেছিল। কিন্তু আমাকে জানতে দেয়নি। একসময় বিরক্ত হয়ে অনেক মারধোর করে। ভীষণ বদমেজাজি আর জেদি ছিল তোদের আব্বা। জোর করে তোদের দাদা বিয়ে করিয়েছেন। তাই রাগ

মেটাতো আমার উপর। আচ্ছা বাদ সেসব কথা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। জান বাঁচানোর তাগিদে মানুষ পালাতে থাকে। অলন্দপুরে পাকিস্তানি ক্যাম্প তৈরি হয়। শহর থেকে একটা দল আসে যারা যুদ্ধ করতে চায় তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে। তোদের আব্বা তার প্রথম স্ত্রীর কাছে বেশি থাকতো। আর তোর দুই চাচা যুদ্ধে চলে যায়। আমি একা ছিলাম খালি বাড়িতে। চারিদিকে অত্যাচার, জুলুম। ইচ্ছে করে দেশের জন্য কিছু করতে। মনে সাহস নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি কমান্ডার আবুল কালামের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। প্রধান শিক্ষক গোপনে গ্রামের যুবক-যুবতীদের অনুপ্রেরণা দিতেন যুদ্ধের জন্য। এ খবর একসময় পাকিস্তানিরা পেয়ে গেল। তিনি শহিদ হলেন। ট্রেনিং-এ জয়েন করি। হয়ে উঠি একজন মুক্তিযোদ্ধা। প্রথম অপারেশনে আমরা সফল হই। অলন্দপুরের ক্যাম্প উড়িয়ে দেই। এরপর চলে যাই আরেক এলাকায়। হাতে রাইফেল নিয়ে পরবর্তী অপারেশনে নামি। তখন ধরা পড়ে যাই পাকিস্তানিদের হাতে। বন্দি করে কারাগারে। স্বচক্ষে দেখি ধর্ষণ,শারিরীক অত্যাচার। কী বর্বরতা তাদের! রড দিয়ে পিটিয়েছে। পিঠের দাগগুলো এখনো আছে। আরো কয়দিন থাকলে হয়তো আমিও ধর্ষণ হতাম। তার আগেই আবুল কালামের বুদ্ধির কাছে হেরে গেল তারা। ফেরার আগে চোখ বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে দুইজনকে ছুরি দিয়ে মৃত্যুর দোয়ারে পাঠিয়ে আসি। দেশ স্বাধীন হয়। চারিদিকে স্বাধীনতার উল্লাস। হাসপাতালে তখন ভর্তি আমি। আরো অনেকে ছিল। সেই হাসপাতালেই ভর্তি ছিল যিশু। সেও একজন মুক্তিযোদ্ধা। রিমঝিমের সাথে ফের দেখা হলো। এক মাস লাগলো সুস্থ হতে। ফেরার সময় সাথে আসে রিমঝিম আর যিশু ভাইয়া। পথে বার বার করে বলি, তোমাদের মতো দেখতে যেন আমার একটা মেয়ে হয়। অলন্দপুরের বাজারে নামিয়ে দিয়ে ওরা আর আসেনি। ফের যদি গ্রামের লোক দেখে ফেলে। কিন্তু আশঙ্কাই ঠিক হলো। অনেকে যিশু ভাইয়ের সাথে আমাকে দেখে ফেলে। বাড়িতে ফিরে তোর আব্বাকে দেখি। তিন মাস পর জানতে পারি আমার পদ্ম আমার পেটে। মনে প্রাণে একটা সুন্দর মেয়ে চাইতে থাকি আল্লাহর কাছে। ঘুমালে স্বপ্ন দেখি রিমঝিমকে। আমার মন খুব চাইতো রিমঝিমের মতো সুন্দর মেয়ে। ঠিক তাই হলো। কিন্তু বদনাম রটে গেল। অনেকে বলে তারা যিশুর সাথে আমাকে দেখেছে। এতদিন যিশুর কাছে ছিলাম।।তারই সন্তান পদ্মজা। এজন্যই এত সুন্দর। আর এতো মিল। তোদের আব্বাও বিশ্বাস করল। আল্লাহ চাইলে সব পারে কেউ বিশ্বাস করল না। কিন্তু জানিস পদ্ম? তুই জন্মের পর থেকেই আমি অলৌকিক ভাবে খুব শক্ত আর কঠিন হয়ে পড়ি। কেউ কিছু বললে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দেই। তোর সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে আসলে দা নিয়ে তেড়ে যাই। এ খবর ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। তার মধ্যে কমান্ডার আবুল কালাম আসেন অলন্দপুরে। গ্রামের অনেকে যুদ্ধে গিয়েছিল। আমি ছাড়া আর একজন ফিরেছিল। বদর উদ্দিন নাম। বদর উদ্দিন এবং আবুল কালামের কাছ থেকে গ্রামবাসী জানতে পারে আমিও যুদ্ধ করেছি। হেমলতা একজন মুক্তিযোদ্ধা। এ খবর শোনার পর থেকে সবাই মোটামুটি সমীহ করে চলতে থাকে। একটা শক্ত জায়গা দখল করে বাঁচতে থাকি। প্রতিটি ঘটনা আমাকে ভেতরে ভেতরে শক্ত করেছে। তুই জন্মের পর বুঝেছি, আমি অনেক কিছু পারি। একা চলতে পারি। '

কথা শেষ করে হেমলতা হাঁফ ছাড়েন। চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ আগে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফজরের আযান পড়বে। পদ্মজা,পূর্ণা স্তব্ধ।

'এই দুনিয়ায় বাঁচার দুটি পথ- চুপ থাকো, নয় প্রতিবাদ করো। কিন্তু আমার নিয়ম বলে, সামনে চুপ থেকে আড়ালে আবর্জনাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। যাতে এই আবর্জনার প্রভাবে আর কিছু না পঁচে।'

কী জানি কেন হেমলতার শেষ কথাগুলো পদ্মজার রগে রগে শিহরণ জাগায়। সে দূরে চোখ রেখে কিছু ভাবতে থাকে। মানুষের জীবনে কত গল্প! কত যন্ত্রনা! হেমলতা নৌকা ঘুরাতে বলেন। মোর্শেদ নৌকা ঘুরায়। বাড়ি ফিরতে হবে। আজ পদ্মজার গায়ে হলুদ। নৌকা চলছে ঢেউয়ের তালে তালে। আগের উত্তেজনাটা আর কাজ করছে না। একটা ইঞ্জিন ট্রলারের শব্দ পাওয়া যায়। চার জন চকিতে সেদিকে তাকায়। ট্রলারে একজন লোক। আরেকজন ট্রলারের ভেতর থেকে সাদা কাপড়ে মোড়ানো কিছু একটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। আবছা আলোয় সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি দেখে পূর্ণার পিলে চমকে উঠল। মানুষ মরার পর সাদা কাপড়ে যেভাবে মোড়ানো হয়,ঠিক তেমন। পর পরই লোক দুটি মোড়ানো বস্তুটি ছুঁড়ে ফেলে পানিতে। মোর্শেদ চেঁচিয়ে উঠেন,'কে রে?'

লোক দুটি তাকায় বোধহয়। এরপর দ্রুত ট্রলারের ভেতর চলে যায়। মোর্শেদ বৈঠা দ্রুত চালিয়েও ধরতে পারল না। ট্রলারটি চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেখানে সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি ফেলা হয়েছে,সেখানে মোর্শেদের নৌকাটি পৌঁছাতেই হুট করে পদ্মজা ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে। হেমলতা আকস্মিক ঘটনায় চমকে যান। আতঙ্ক নিয়ে ডাকেন,'পদ্ম...'

পদ্মজার দেখা নেই। তিনি নৌকা থেকে ঝাঁপ দিতে যাবেন তখনি পদ্মজা ভেসে উঠে। হাতে সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি। পদ্মজা মুখ তুলেই হেমলতাকে বলল,'আম্মা,আমি ঠিক ভেবেছি। এটা লাশ।'

পূর্ণা লাশ শুনেই কাঁপতে থাকে। অথচ পদ্মজা স্থির,ঠান্ডা।এই শেষ রাত্রিরে নদীর জলে ভেসে আছে দু'হাতে মৃত মানুষ জড়িয়ে ধরে!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ২৬
_____
লাশটি নৌকায় তুলতেই পূর্ণা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। মোর্শেদের পাশ ঘেঁষে বসে। তার মনে হচ্ছে চারিদিক থেকে প্রেতাত্মারা তাকিয়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঘাড় মটকে দেবে। ঘাড় মটকানোর কথা ভাবতেই পূর্ণার ঘাড় শিরশির করে উঠল। 'ভূত,ভূত' বলে চেঁচিয়ে উঠে। হঠাৎ পূর্ণার চিৎকার শুনে মোর্শেদ ভয় পেয়ে যান। এমনিতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে লাশ দেখে। তিনি পূর্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন,'কোনহানে ভূত? ডরাইস না।'

মাথার কাছে বাঁধা দড়িটা খুলে কাপড় সরাতেই একটা মৃত মেয়ের মুখ ভেসে উঠে। হেমলতা,পদ্মজা দুজনই ভেতরে ভেতরে চমকে যায়। কিন্তু প্রকাশ করল না। হেমলতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে মানুষের উপস্থিতি দেখেন। এরপর কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলেন,'চিনি না তো। তুই চিনিস?'

Kobitor.com

পদ্মজা মাথা নাড়িয়ে জানাল, সে চিনে না। পরপরই মোর্শেদকে ডাকল পদ্মজা,'আব্বা,দেখো তো তুমি চিনো নাকি?'

মোর্শেদ উঠে আসতে চাইলে পূর্ণা ধরে রাখে। মোর্শেদ পূর্ণাকে নিয়েই এগিয়ে আসেন। মৃত মেয়েটার মুখ দেখে বলেন,'না,চিনি না।'

হেমলতা চিন্তায় পড়ে যান। শরীরের পশম কাঁটা দিচ্ছে। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা। হীমশীতল বাতাস। আর সামনে সাদা কাপড়ে মোড়ানো এক মেয়ের লাশ। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বললেন,'কোন মায়ের বুক খালি হলো কে জানে!'
পদ্মজা বিড়বিড় করে,'আমার এক জনকে চেনা লাগছে আম্মা।
হেমলতা ধৈর্য্যহারা হয়ে প্রশ্ন করেন,'কে? চিনেছিস? নাম কী? জানিস?'
পদ্মজা ভাবছে। গভীর ভাবনায় ডুবে কিছু ভাবছে। হেমলতার প্রশ্নের জবাবে বলে,'নাম জানি না আম্মা। দাঁড়াও আমি বলি লোকটা কেমন!'

পদ্মজা চোখ বুজে। কিছুক্ষণ আগের মুহূর্তে ফিরে যায়। চোখ বুজা অবস্থায় রেখে বলে,'আব্বা যখন বললো, কে রে? তখন একটা লোক আমাদের দিকে তাকায়। লোকটার চোখগুলো ভীষণ লাল। অনেক মোটা, খুব কালো। মাথার চুল ঝুটি বাঁধা ছিল। এমন একজন লোক আমি স্কুল থেকে ফেরার পথে অনেকবার দেখেছি।'
কথা শেষ করেই পদ্মজা চোখ খুলে। খুশিতে গদগদ হয়ে বলল,'লোকটার দেখা পেলে আমি ঠিক চিনে ফেলব আম্মা।'
'চিনে কী হবে? প্রমাণ তো নেই। আর মেয়েটা মারা গেছে নাকি খুন সেটা তো জানি না।'
'প্রমাণ নেই তা ঠিক। কিন্তু মেয়েটা খুন হইছে আম্মা। এই দেখো, মেয়েটার গলায় কত দাগ। আর পেটের কাছে দেখো রক্তের দাগ। নদীর পানি পুরোটা রক্ত মুছে দিতে পারেনি।'

হেমলতা অবাক হয়ে পদ্মজার কথামতো খেয়াল করে দেখেন। সত্যি তো! তিনি বিস্ময় নিয়ে বলেন,'একটার পর একটা খুন! হানিফের পর প্রান্তর বাপ এরপর এই মেয়ে। আমি বুঝে উঠতে পারছি না কে বা কারা এমন করছে।'
'ওই লোকটার দেখা যদি আরেকবার পাই,আমি ঠিক এর রহস্য বের করবই আম্মা।' বলল পদ্মজা। মৃত মেয়েটার মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল পদ্মজা। এরপর দড়ি দিয়ে আগের মতো বেঁধে, মোর্শেদকে বলল,'আব্বা কলাপাড়ার দিকে যাও।'
'ওখানে কী?' হেমলতা বললেন।

পদ্মজা শান্ত কণ্ঠে বলল,'কলা গাছের ভেলা বানিয়ে লাশ ভাসিয়ে দেব আম্মা। পানিতে ফেললে কেউ পাবে না। ভাসিয়ে দিলে কেউ না কেউ পাবে। মেয়েটার পরিবার খুঁজে পাবে। আমাদের বাড়িতে এখন লাশ নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। অনেক মানুষ আছে। সবাই ভয় পাবে। বিয়ের আমেজটা চলে যাবে। এক সপ্তাহও হয়নি ওই ঘটনাটা পার হওয়ার। আম্মা বুঝছো আমি কী বলতে চাইছি?'

হেমলতা কিছু মুহূর্তকাল পদ্মজার চোখে চোখ রেখে বসে রইলেন। পদ্মজার কথার উত্তর না দিয়ে, মোর্শেদকে বললেন,'কলাপাড়ার দিকে যাও।'

_____
সকাল সকাল গায়ে হলুদ করার কথা ছিল। কিন্তু বউ এখনো ঘুমে। বাড়ি ভর্তি মানুষ। কলাগাছের ছাদ বানিয়ে সবাই অপেক্ষা করছে। হেমলতা কিছুতেই পদ্মজাকে ডাকতে দিচ্ছেন না। দুপুরের আযান পড়তেই পদ্মজা ধড়ফড়িয়ে উঠে। মনে পড়ে,আজ তার গায়ে হলুদ। সেই কাকডাকা ভোরে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়েছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই। বালিশের পাশে হলুদ শাড়ি রাখা। পদ্মজা দ্রুত শাড়িটা পরে নেয়। এরপর পূর্ণাকে ডাকে। বাহিরের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। পদ্মজা দরজা খুলতেই, নয় বছর বয়সী একটা মেয়ে চেঁচিয়ে বাইরে খবর দিল,'পদ্ম আপার ঘুম ভাঙছে।'

হানি উঠান থেকে পদ্মজার ঘরের সামনে আসেন। হেমলতা রান্নাঘরের সামনে বসে মুরগি কাটছিলেন। হানি হেমলতাকে শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলেন,'এবার নিয়ে যেতে পারি তোর চাঁদরে?'
'যাও।' বললেন হেমলতা।
হানি,মনজুরা,সম্পর্কে ভাবি হয় এমন আরো দুজন পদ্মজাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। গায়ে হলুদের স্থান বাড়ির পিছনে। মোর্শেদ এসে পথ আটকান। গামছা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে বলেন,'আমার ছেড়িরে আমি লইয়া যামু ছাদনাতলায়।'
কথা শেষ করে মোর্শেদ পদ্মজাকে পাজাকোলে তুলে নেন। হানি চেঁচিয়ে উঠে বলেন,'আরে মিয়া করেন কি? দুলাভাইরা কোলে নেয় তো।'
'বাপ নিলে বিয়া অশুদ্ধ হইয়া যাইব না।'

মোর্শেদ বাইরে পা রাখেন। পদ্মজা লজ্জায় শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে। অজানা অনুভূতিতে হাত পা কাঁপছে। মানুষের উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ বেড়ে যায়। প্রেমা,প্রান্ত খুশিতে লাফাচ্ছে। একজন আরেকজনকে রঙ দিয়ে মাখিয়ে দিচ্ছে। কলা গাছের ছাদের নিচে খাটের ছোট চৌকিতে পদ্মজাকে দাঁড় করিয়ে দেন মোর্শেদ। সামনে সাতটা বদনা,দশটা কলসি ভর্তি পানি। একটা খোলায় দূর্বা,ধান,হলুদ বাটা,হলুদ শাড়ি, ব্লাউজ, তোয়ালে,সাবান,। কাছে কোথাও একদল নেচে নেচে গীত গাইছে। ছেলেমেয়েরা একজন আরেকজনকে জোর করে ধরে হলুদ মাখিয়ে দিচ্ছে। পদ্মজার জন্য রাখা হলুদ অনেকেই নিতে চাইছে। হানির জন্য পারছে না। হানি পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হানির ছেলে অনন্ত এসে হলুদ চাইলে,হানি মার দিবে বলে তাড়িয়ে দিলেন। হেমলতা এসে ভীর কমিয়ে দেন। চারিদিকে পর্দা দিয়ে ঘিরে দেন। এরপর ৬-৭ জন মহিলাকে নিয়ে হলুদের গোসল শেষ করেন। এজন্য অনেকে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। গায়ে হলুদ করতে হয় সবাইকে নিয়ে,সবার সামনে। আনন্দ করতে করতে। হেমলতা কেন শুধুমাত্র ৬-৭ জন নিয়ে করছেন। হেমলতা তার জবাব দিলেন না। অবুঝদের সাথে তর্ক করে লাভ নেই। গোসল শেষ করে মসলিন কাপড়ের হলুদ শাড়ি পরানো হয় পদ্মজাকে। কানের কাছে মনজুরা গুনগুন করে কাঁদছেন। পদ্মজার শুনতে ভাল লাগছে না। বিয়ে হলে নাকি এক সপ্তাহ আগে থেকে কান্নাকাটি শুরু হয়। গায়ে হলুদের দিন আত্মীয়রা কাঁদায় গড়াগড়ি করে কাঁদে। অথচ, পদ্মজা,হেমলতা শান্ত!

পদ্মজাকে গায়ে হলুদের খাবার দেয়া হয়। বিশাল এক থালা। তাতে কয়েক রকমের পিঠা,আস্তো একটা মুরগি,পোলাও,শাক। পদ্মজা খাওয়ার আগে অন্যরা কেড়ে নিয়ে যায় সব। ভীর কমতেই হেমলতা আলাদা করে প্লেটে করে ভাত আর হাঁসের মাংস নিয়ে আসেন। নিজ হাতে খাইয়ে দেন। খাওয়ার মাঝে পদ্মজার মনে পড়ে মনজুরা তখন বলেছিলেন,'বিয়ের পর মেয়েরা পর হয়ে যায়। মা-বাবা পর হয়ে যায়। স্বামী আর স্বামীর বাড়িই সব। মা-বাপের সাথে দেখা করতেও তাদের অনুমতি লাগবে।'

পদ্মজা হেমলতার দিকে তাকিয়ে ভাত চিবোয়। হেমলতা খেয়াল করেন পদ্মজা তার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। চোখের পলকই ফেলছে না। চোখে জল চিকচিক করছে। তিনি পদ্মজাকে বলেন, 'খাওয়ার সময় কাঁদতে নেই।'

পদ্মজা ফোঁপাতে থাকল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে খাবার শেষ করে। চোখের জলে বুক ভিজে একাকার। হেমলতা ঘরের বাইরে এসে হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছেন। কী যে যন্ত্রনা হচ্ছে বুকে! কাঁদতে পারলে বোধহয় ভালো হতো। কিন্তু কাঁদার সময় কোথায়? সবার সামনে যে তিনি আর কাঁদতে পারেন না। ভীর কমলে কাঁদবেন। অনেক কাঁদবেন। জীবনে শেষ বারের মতো কাঁদবেন। এরপর আর কখনো কাঁদবেন না। কোনোদিনও না।

_____

পদ্মজার দু'হাতে গাছের মেহেদী লাগানো হচ্ছে। উঠানে বড় চৌকি রেখে চারিদিকে রঙিন পর্দা টাঙানো হয়েছে। কাগজের ফুল মাথার উপর ঝুলানো। চারিদিকে ঘিরে মেয়েরা। সামনের খালি জায়গায় চলছে নাচ। তখন উপস্থিত হয় হাওলাদার পরিবার। লাবণ্য,রানী এবং তাদের আত্মীয়। সাথে নিয়ে এসেছে বউয়ের বেনারসি,গহনা। হানি ছুটে এসে সবার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। শেষে বাড়িতে ঢুকে আমির। বিয়ের আগের দিন রাতে বরের আগমন সবাইকে খুব হাসালো। কেউ কেউ বলল,এতো সুন্দর বউ দূরে রাখার আর তর সইছে না। তাই চলে এসেছে। আমির সেসব পাত্তা দিলো না।সোজা হেমলতার কাছে গেল। গিয়ে বলল,'আম্মা,পদ্মজার সাথে একটু কথা বলতে চাই।'

আমিরের অকপট অনুরোধ। হেমলতা ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন আমিরের দিকে। এমন ছেলে তিনি দুটো দেখেননি। আমির আবার বলল,'বেশিক্ষণ না,একটু সময়।'

আমিরের কণ্ঠ পরিষ্কার। অথচ মাথা নিচু। পরিবারের ভাল শিক্ষাই পেয়েছে। তবে লাজলজ্জা একদমই নেই। হেমলতা মৃদু হেসে বলেন,' ঘরে গিয়ে বসো। পদ্ম আসছে।'

আমির হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করে পদ্মজার ঘরের দিকে চলে গেল। হেমলতা পদ্মজাকে ডেকে নিয়ে আসেন। বলেন,আমির কথা বলতে চায়। ব্যাপারটা লোকচক্ষুর। কিন্তু না তো করা যায় না। কোনো বিশেষ দরকার হয়তো। পদ্মজা ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। পিছন ফিরে তাকায়। হেমলতা ইশারায় যেতে বলেন। পদ্মজা ঘরে ঢুকে ডাগর ডাগর চোখ মেলে আমিরের দিকে তাকায়। আমিরকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু নিয়ে খুব চিন্তিত। আমির পদ্মজাকে দেখেই হাসল। বলল,'বসো।'

পদ্মজা বিছানার এক পাশে বসে। অন্য পাশে বসে আমির। প্রশ্ন করে,'পদ্মজা যা প্রশ্ন করি সত্যি বলবে।'
পদ্মজা দৃঢ়কণ্ঠে বলল,'আমি মিথ্যে বলি না।'
আমির অসহায়ের মতো বলল,'তুমি এই বিয়েতে মন থেকে রাজি তো পদ্ম?'
পদ্মজা চকিতে তাকাল। আবার চোখ সরিয়ে নিল।বলল,'আম্মা যখন যা করেছেন তাই আমি মন থেকে মেনে নিতে পেরেছি।'
আমির আবার প্রশ্ন করল,'লিখন শাহ তো তোমাকে পছন্দ করে।'

'জানি। আর আপনিও জানেন সেটাও জানি।'
'আমি আমাদের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর জেনেছি। তুমি...মনে কিছু নিও না, বলতে চাইছি যদি তোমার আমাকে অপছন্দ হয় আর লিখন শাহকে পছন্দ করে থাকো বলতে পারো। আমি বিয়ে ভেঙে দেব।'
পদ্মজা অপমানে থমথম হয়ে উঠল। গম্ভীর স্বরে বলল,'অবিশ্বাস থাকলে বিয়ে না হওয়াই ভাল। আপনি ভেঙে দিতে পারেন।'

আমিরের চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। পদ্মজা এত কথা বলতে পারে ভাবতেও পারেনি। আমির ইতস্তত করে বলল,'আমার কোনো অবিশ্বাস নেই। তোমার মনে কেউ না থাকলে বিয়ে আমার সাথেই হবে। আর কারোর সাথে হতে দেব না।'

পদ্মজা কিছু বলল না। উঠে যেতে চাইলে আমির বলল,'একবার হাত ধরা যাবে?'

'আগামীকাল থেকে হাত ধরে দিনরাত বসে থাকিয়েন।' বলল পদ্মজা। সাথে হাসলও। আমির তা খেয়াল করে বলল,'সুবহানআল্লাহ।'

_____
বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ। পদ্মজা বধূ সেজে বসে আছে। দুই পাশে বসে আছে পূর্ণা ও প্রেমা। কাজী বিয়ে পড়াচ্ছেন। অনেকক্ষণ ধরে পদ্মজাকে কবুল বলতে বলছেন। পদ্মজা কিছুতেই বলছে না। সে নিজ মনে হেমলতাকে খুঁজছে। বউ কবুল বলছে না শুনে অনেকে ভীড় জমিয়েছে। হেমলতা ভীড় ভেঙে ঘরে ঢুকেন। হেমলতাকে দেখে পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটে। ছলছল চোখ নিয়ে তিনবার কবুল বলে। হেমলতার দুই চোখে পানি। কিন্তু ঠোঁটে হাসি। পদ্মজাকে বধূ সাজাবার পর মাত্র দেখলেন তিনি। লাল বেনারসিতে পদ্মজার রূপ যেন গলে পড়ছে। পাশের ঘরে কে যেন কাঁদছে! হেমলতা দেখতে যান।

আয়না দেখানো পর্ব শুরু হয়। আয়নায় তাকাতেই আমির চোখ টিপল। পদ্মজা লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিল। আমির সবার চোখের আড়ালে পদ্মজার এক হাত খপ করে ধরে ফেলে। পদ্মজা কেঁপে উঠে ভয়ে। আমির ফিসফিস করে বলল,'এইযে ধরলাম মৃত্যুর আগে ছাড়ছি না।'

বিয়ে বাড়ির ভীড় কমে গেছে। বিদায়ের পালা চলছে। করুণ কান্নার স্বরে চারিদিক হাহাকার করছে। মনজুরা, হানি কেঁদে কুল পাচ্ছে না। মোর্শেদ নদীর ঘাটে বসে গোপনে চোখের জল ফেলছেন। পূর্ণা পদ্মজার গলা জড়িয়ে সেই যে কান্না শুরু করেছে থামছেই না। প্রেমা,প্রান্ত কাঁদছে। কাঁদছে আরো মানুষ। একটা মেয়ের বিয়ের বিদায় পর্ব কতটা কষ্টের তা শুধু সেই মেয়ে আর তার পরিবার জানে। পদ্মজা কাঁদছে। পূর্ণার মাথায়,পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বার বার বলছে,'বোন,বোন আমার। মন খারাপ করে থাকবি না কিন্তু। একদম কাঁদবি না। আমি আসব। তুইও যাবি। আমার খুব কষ্ট হবে রে বোন। আর কাঁদিস না। এভাবে কাঁদলে অসুস্থ হয়ে যাবি।'
রিদওয়ান তাড়া দেয়,'সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি করুন।'
পদ্মজা আকুল হয়ে কেঁদে ডাকে,'আম্মা কই? আমার আম্মা কই? আম্মা,ও আম্মা।'

হেমলতা লাহাড়ি ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পদ্মজার ডাকে হেঁটে আসেন। একেকটা পা মাটিতে ফেলছেন আর বুক ব্যথায় চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তবুও হাসার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন

না। যে মেয়ের জন্য তিনি নতুন করে জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছিলেন সেই মেয়ের আজ বিদায়। সারাজীবনের জন্য অন্যের ঘরে চলে যাবে। হেমলতাকে দেখেই পদ্মজা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হেমলতা দ্রুত চোখের জল মুছে, পদ্মজাকে আদুরে কণ্ঠে বললেন,'এভাবে কাঁদতে নেই মা। বিয়ে তো হবারই কথা ছিল।'
'আম্মা,আমি তোমাকে ছাড়া থাকব কেমন করে?'
'সবাইকেই থাকতে হয়। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে মা।'
হেমলতা পদ্মজার কপালে চুমু খান। পদ্মজার দুই চোখের জল মুছে দিয়ে বলেন,' শ্বশুর বাড়ির সবার সাথে মিলেমিশে থাকবি। নিজের খেয়াল রাখবি।'
পদ্মজা হেমলতাকে জোরে চেপে ধরে বলে,'আম্মা,আমি যাব না। আম্মা যাব না আমি।'

হেমলতা পদ্মজার মুখের দিকে চাইতে পারছেন না। ভাঙা গলায় আমিরকে ডেকে বলেন,'নিয়ে যাও আমার মেয়েকে। খেয়াল রেখো। ওর আব্বা ঘাটে বসে আছে। ডাকতে হবে না, একা থাকুক। তোমরা পদ্মকে নিয়ে যাও। সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে।'
আর কিছু বলতে পারলেন না। চোখ বেয়ে টুপটুপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে মাটিতে,পদ্মজার বেনারসিতে।

আমির পদ্মজাকে পাঁজাকোলা করে নেয়। পদ্মজা আকুতিভরা কণ্ঠে হেমলতাকে ডেকে অনুরোধ করে,তাকে জড়িয়ে ধরে রাখতে। হেমলতা রাখেননি। মুখ ঘুরিয়ে নেন। পূর্ণা দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। পদ্মজাকে পালকিতে বসিয়ে দেয় আমির। এরপর দু'হাত পদ্মজার গালে রেখে বলল,'একদিন পরই আসব আমরা।'

পদ্মজা দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠে। সব কিছু শূন্য লাগছে। মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে গেছে। পালকি ছুটে চলছে শ্বশুরবাড়ি। পূর্ণা হেমলতাকে জড়িয়ে ধরে বলে,'আম্মা,কেন বিয়ে দিলা আপার। তোমার কী কষ্ট হচ্ছে না?'

হেমলতা হাঁটুভেঙে মাটিতে বসে পড়েন। পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে গগণ কাঁপিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠেন। উপস্থিত সবার কান্না থেমে যায়। হেমলতা পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,'আমি যদি পারতাম আমার পদ্মকে বিয়ে দিতাম না পূর্ণা। ও যে আমার সাত রাজার ধনের চেয়েও বেশি কিছু।'

হানি বরাবরই কাঁদুক স্বভাবের। হেমলতা কখনো কাঁদে না। সেই হেমলতাকে এভাবে কাঁদতে দেখে কান্না লুকিয়ে রাখতে পারল না। হেমলতার মাথা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল,'এটাই তো নিয়ম। কেঁদে আর কী হবে।'

হেমলতা মুহূর্তে ছোট বাচ্চা হয়ে যায়। হানিকে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে।বলে,'আপা,আপা ওরা আমার মেয়ে নেয়নি। আমার কলিজা ছিঁড়ে নিছে। আপা,কেন বিয়ে হলো আমার পদ্মের।'

মনজুরা হেমলতার মাথায় হাত রেখে স্বান্তনা দেন,'দেখিস পদ্ম খুব ভালো থাকবে। ও খুব ভালো মেয়ে।'

Kobitor.com

হেমলতা হানিকে ছেড়ে মনজুরাকে জড়িয়ে ধরেন। হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,'আম্মা, আম্মা তুমি কখনো আমাকে কিছু দেওনি। এইবার আমার এই মরণ কষ্টটা কমিয়ে দাও। আম্মা আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বিশ্বাস করো আম্মা। আম্মা,আমার পদ্মকে ছাড়া আমি কেমনে থাকব।'

মনজুরার বুক ধুকপুক করছে। জন্মের পর হেমলতা কী কখনো এভাবে কেঁদেছে? মনে পড়ছে না। তিনি পারেননি হেমলতার এই কষ্ট কমাতে। শুধু বুকের সাথে চেপে ধরে রাখলেন। এভাবে যদি ছোট থেকে আগলে রাখতেন,হেমলতার জীবনটা এত কষ্টের হতো না।

পদ্মজা ছটফট করছে। কিছু ভাল লাগছে না। ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে যেতে মায়ের কাছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। এখুনি মারা যাবে হয়তো। পদ্মজা হঠাৎ চিৎকার করে উঠে,'থামো তোমরা,থামো। আল্লাহর দোহাই লাগে থামো।'

পালকি থেমে যায়। পদ্মজা পালকি থেকে মাটিতে পা রেখেই মোড়ল বাড়ির দিকে ছুটতে থাকল। কেউ আটকে রাখতে পারেনি। সবাইকে ধাক্কা দিয়ে দূরে ঠেলে ছুটে চলেছে সে মায়ের বুকে। আমির শুধু চেয়ে রইল। সন্ধ্যা নামার পূর্ব মুহূর্তে একটা লাল বেনারসি পরা অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ছুটছে। দেখতেও ভাল লাগছে।

চলবে...
পুনশ্চঃ দাদুর কাছ থেকে তখনকার গ্রামের গায়ে হলুদ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে লিখেছি। নেত্রকোনার নিয়মে।

আমি পদ্মজা - ২৭

পদ্মজার কণ্ঠে আম্মা ডাকটি হেমলতার অস্তিত্ব মাড়িয়ে দিয়ে গেল। হেমলতা থমকে গিয়ে তাকান। উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত হতেই পদ্মজা ঝাঁপিয়ে পড়ে হেমলতার বুকে। হেমলতা টাল সামলাতে না পেরে আবার মাটিতে বসে পড়েন। পদ্মজা নিরবচ্ছিন্ন কাঁদতে থাকল। হেমলতা সীমাহীন আশ্চর্য হয়ে,কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। নির্বাক,স্তব্ধ থেকে পদ্মজার কান্না অনুভব করেন। কান্নার দমকে পদ্মজার শরীর ঝাঁকি দিচ্ছে বারংবার। পূর্ণা পদ্মজাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল,'আর যাবা না আপা।'
পদ্মজা অনুরোধ স্বরে হেমলতাকে বলল,'আম্মা,আমি যাব না।'

হেমলতার দুই চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। প্রতি ফোঁটা জল পদ্মজার বুকে সাইক্লোন, টর্নেডো,ঘূর্ণিঝড়,ভূমিকম্প সহ সব ধরণের দূর্যোগ বইয়ে দিচ্ছে। হেমলতা শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন পদ্মজাকে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন,'কোথাও যেতে হবে না তোর।'

হেমলতার এহেন কথা শুনে হানি,মনজুরার মাথায় বাজ পড়ল। সেকী কথা! হেমলতা একবার যখন বলেছে তাহলে সত্যি যেতে দিবে না। তাহলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কী দরকার ছিল! হানি শক্ত কিছু কথা শোনানোর জন্য প্রস্তুত হয়। তখনই হেমলতা পদ্মজাকে সরিয়ে দেন নিজের কাছ

Kobitor.com

থেকে। চোখে মুখ শক্ত করে কাঠ কাঠ কণ্ঠে বলেন,'এটা ঠিক হয়নি পদ্ম! এভাবে চলে আসা মোটেও ভদ্রতা নয়। আবেগকে এতো প্রশ্রয় দিতে নেই। বিয়ে দিয়েছি এবার শ্বশুর বাড়ি যেতেই হবে। ওইতো আমির এসেছে।'

হেমলতা হাত ঝেড়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়ান। পদ্মজা হা করে তাকিয়ে আছে হেমলতার দিকে। চোখের পলকে কী রকম রূপ পাল্টে ফেলল। এইতো মাত্রই কাঁদছিল!

পদ্মজা নিজের চুলে আঙ্গুল পেঁচাতে পেঁচাতে হাসছে। তুষার রয়ে সয়ে প্রশ্ন করল,'হাসছেন কেন?'
পদ্মজা নাটকীয়ভাবে ব্যথিত স্বরে বলল,'আপনি কাঁদছেন তাই।'
তুষার দ্রুত চোখের জল মুছল। মৃদু হেসে বলল,'কাঁদছি নাকি!'
পদ্মজা হঠাৎ গুনগুনিয়ে কাঁদতে শুরু করল। তুষার জানতে চাইল,'আপনি কাঁদছেন কেন?'
মুহূর্তে পদ্মজা দাত কেলিয়ে হেসে উঠে। চোখে জল ঠোঁটে হাসি নিয়ে বলে,'মনে চাইলো। আম্মা বলতেন,যখন যা ইচ্ছে হয় করে ফেলতে। তাতে কারো ক্ষতি বা নিজের কোনো ক্ষতি না হলেই হলো।'
'আপনার মায়ের খবরটা গতকাল শুনলাম। জানেন,সারারাত ঘুমাতে পারিনি।'
'আপনার মনটা খুব নরম স্যার। কিন্তু কঠিন ভাব নিয়ে থাকেন,আমার আম্মার মতো।'
'তারপর কী হলো?'
পদ্মজা চেয়ার ছেড়ে ফ্লোরে বসে বলল,'আর তো বলব না।'
তুষার শ্বাসরূদ্ধকর কণ্ঠে বলল,'কেন?'
পদ্মজা ঘাড়ে এক হাত রেখে ক্লান্তভঙ্গিতে বলল,'এমনি।'
'হেয়ালি করবেন না পদ্মজা। আপনি ছাড়া এই রহস্যের কিনারা অসম্ভব। আপনার পুরো গ্রাম আপনার বিপক্ষে। খুনের কারণ ও কেউ বলতে পারছে না। আমরা তদন্ত করেও কুল পাচ্ছি না।'

পদ্মজা চোখ গরম করে তাকায়। কটমট করে বলল,'বলব না মানে বলব না।'
তুষার দ্বিগুণ গলা উঁচিয়ে বলল,'তাহলে এতটুকু কেন বললেন?'
'আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই।'
'আপনার ইচ্ছায় সব হবে না।'
'যা খুশি করে নিতে পারেন।'

পরিস্থিতি বিগড়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামলাতে তুষার দুই হাতে মুখ ঢেকে রাগ নিয়ন্ত্রণ করে। এরপর ধীরেসুস্থে বলে,'দেখুন আপনি যদি সব খুলে না বলেন আমি আপনাকে আইনের হাত থেকে বাঁচাতে পারব না। নির্দোষ প্রমাণ করতে পারব না। আর আমার মন বলছে,আপনি দোষ করতে পারেন না।'
'সবসময় মন সঠিক কথা বলে না।' বলল পদ্মজা, করুণ স্বরে।
'তাহলে বলছেন,আপনি নির্দোষ না?'

পদ্মজা চোখ সরিয়ে নিল। হাসল। কী যন্ত্রনা! কত কষ্ট সেই হাসিতে! চোখ ভর্তি জল নিয়ে আবার তাকাল তুষারের দিকে। বলল,'আমি খুন করেছি। একই রাতে,একই প্রহরে,একই জায়গায় একসাথে পাঁচ জনকে। আপনার আইন যা শাস্তি দেয় আমি মাথা পেতে নেব।'

তুষার অধৈর্য্য হয়ে বলে,' আপনার ফাঁসির রায় হবে পদ্মজা। আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার আপনাকে বাঁচাতে ইচ্ছে হচ্ছে।'
'ওপারে যাওয়া আমার জরুরি। আমি সব রায় মেনে নেব।'
'আমি মানতে পারব না।' তুষারের অকপট কথা। কথাটা মুখ থেকে বের হওয়ার পর তুষার বুঝলো সে অচেনা এবং ভয়ংকর অনুভূতি নিয়ে খেলছে। পদ্মজার দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। পদ্মজা তুষারকে পরখ করে নিয়ে হাসে। শান্ত ভঙ্গিতে বলল,'এতো ব্যকুল কেন হচ্ছেন?'

বেশ অনেকক্ষণ তুষার গাঁট হয়ে বসে রইল। উপর থেকে অর্ডার এসেছে,আসামী পদ্মজা কেন এতোগুলি খুন করেছে তার রহস্য উদঘটন করতে। না পারলে চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরি চলে যাক সমস্যা নেই,নিজের শান্তির জন্য আত্মতৃপ্তির জন্য হলেও পদ্মজার পেছনের ছয়টি বছরের গল্প জানতেই হবে। এই কেস হাতে পাওয়ার পর থেকে তার ঘুম হচ্ছে না রাতে। সারাক্ষণ মস্তিষ্ক কিলবিল করে। এতো জটিল কেস কখনো ফেস করতে হয়নি। অলন্দপুর পুরোটা ঘেঁটেও কিছু জানা যায়নি। যারা খুন হয়েছে তারা আর পদ্মজা ছাড়া হয়তো কেউ জানেও না। তুষার আবার বলল,'আপনার বিরুদ্ধে সব প্রমাণ। আপনার বিরুদ্ধে সবাই সাক্ষী দিচ্ছে। আপনি কী..."

কথার মাঝপথে তুষারকে থামিয়ে দিয়ে পদ্মজা বলল,'খুনগুলো তো সত্যি আমি করেছি। তাহলে প্রমাণ আমার বিরুদ্ধেই তো থাকবে।'
তুষারের মন বিরক্তে তেঁতো হয়ে পড়ে। পদ্মজার সামনে কয়েকবার পায়চারি করে বেরিয়ে যায়। সিগারেট ফুঁকে মাথা ঠান্ডা করে। ফাহিমা চা নিয়ে আসে। তুষার বলল,'মেয়েটাকে তোমার অপরাধী মনে হয়?'
'আমি কিছু ভাবতে পারছি না স্যার। মেয়েটাকে দেখলে আমার হাত পা অবশ হয়ে পড়ে। এতো মেরেছি শুরুতে। কিছুতেই টু শব্দও করেনি। এরপর থেকে আমি রাতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখি।'
'পৃথিবীটা রহস্যে ঘেরা ফাহিমা। একজন নারী পাঁচ জনকে কীভাবে খুন করতে পারে? আবার একসাথে? সেই সাহস কী করে পেল?'
'সেটা আমিও ভাবছি স্যার। কীভাবে খুন করেছে সেটা ধারণা করা যাচ্ছে। কিন্তু এতো সাহস,ধৈর্য্য কীভাবে কোনো নারীর থাকতে পারে!'
'নারীরা চাইলে সব পারে। কথাটা শুনে এসেছি। এবার স্বচক্ষে দেখছি।'
'জি স্যার।'
'কত আসামী পায়ে পড়ে জীবন ভিক্ষা চেয়েছে। কিছুতেই মন গলেনি। মন কাঁদেনি। এই মেয়েটা জীবন চায় না,তবুও আমার ইচ্ছে হচ্ছে জীবন দিতে,নির্দোষ প্রমাণ করে বাঁচাতে।'

ফাহিমা চকিতে তাকাল তুষারের দিকে। তুষার সবসময় হু,হ্যাঁ এর বাইরে কিছু বলে না। খুব কঠিন,কাঠখোট্টা একটা মানুষ। অনুভূতি বলতে নেই। তার মুখে এত কথাবার্তা শুনে অবাক হচ্ছে ফাহিমা।

'পরিস্থিতি হাতের বাইরে স্যার। পদ্মজার ফাঁসি দেখার জন্য দেশ উতলা হয়ে আছে।'
'কেন এমন হচ্ছে ফাহিমা?'
'আজ যদি হেমলতা উপস্থিত থাকতেন গল্পটা অন্যরকম হতো স্যার।'

Kobitor.com

তুষার আবার ফিরে আসে। পদ্মজার সামনে চেয়ারে বসে। ধীরকণ্ঠে বলে,'আজই শেষ দিন। এরপর আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না।'
পদ্মজা চকিতে তাকাল। দ্রুত তুষারের পায়ের কাছে এসে বসল। বলল,'আপনার আম্মা আপনাকে বিয়ে করতে চাপ দেয় তাই না?'
'আপনি কী করে জানলেন?'
'সেদিন দেখলাম ফোনে কাউকে আম্মা ডেকে রেগে বলছিলেন,বিয়ে করব না।'
'আমি তো অনেক দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। আপনার শ্রবণ শক্তি তো প্রখর।' তুষার বলল। এরপর থামল। লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বলল,'আপনার মা বিশ্বাসঘাতকতা কী কথা লুকিয়ে করেছেন?'
'আপনি জানলেন কী করে?'
'কিছু তথ্য পেয়েছি গতকাল। এইটুকুর জন্য বিশ্বাসঘাতক অপবাদ দিতে পারেন না। উনি আপনার ভালোর জন্যই..."

পদ্মজা চুপ থেকে হুট করে ফোঁস করে জ্বলে উঠে বলল,'আপনি বুঝবেন না আমার কষ্ট। আমার না পাওয়া দামী সময়টাকে আমি কতবার মনে করে বুক ভাসিয়ে কেঁদেছি। বুঝবেন না আপনি।'

পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে বলল। পরপরই হেসে আবার করুণস্বরে কান্না শুরু করল। গা কাঁপিয়ে তোলার মতো কান্না। মনে হয় কোনো অশরীরী কাঁদছে। কী বিশ্রি,ভয়ংকর সেই কান্নার ছন্দ। তুষারের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে।
চিন্তায় মাথার রগ দপদপ করছে। আগামীকাল ভোরে পদ্মজাকে কোর্টে তোলা হবে,রায় হবে। পদ্মজার ফাঁসি চাই বলে,রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলন। রেডিওতে আন্দোলন। কিন্তু তুষারের মন যে কিছুতেই মানতে পারছে না এই আন্দোলন। এমন নিষ্পাপ মনের, অপরূপ সুন্দরীর বিরুদ্ধে পুরো পৃথিবী! কী আশ্চর্য তাই না!

বাঁকা রাস্তা পেরিয়ে পালকি চলছে ধীরে ধীরে। সন্ধ্যার আযান পড়েছে কিছুক্ষণ আগে। দিনের আলো কিছুটা এখনও রয়ে গেছে। দক্ষিণ দিক থেকে ধেয়ে আসছে হাওয়া। শীতল, নির্মল পরিবেশ। পদ্মজার বুক ধুকপুক করছে। নতুন মানুষ নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবে তো! একবার সে হাওলাদার বাড়ি গিয়েছিল। অন্দরমহল নামে এক বিশাল বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে মেয়েরা,বউরা থাকে। এখন কী সেও থাকবে? পদ্মজা পর্দার ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরে চোখ মেলে তাকায়। আমির হাতে পাগড়ী নিয়ে তার বড় ভাইয়ের সাথে কী যেন আলোচনা করছে। চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। পদ্মজা চোখ সরিয়ে নিল। মায়ের কথা,পূর্ণার কথা খুব মনে পড়ছে।

পালকি থামে। আমির থামিয়ে দিল। অন্দরমহলে মেয়েরা অপেক্ষা করছে নতুন বউয়ের জন্য। আর আমির গেইটের সামনেই পালকি থামিয়ে দিল। জাফর বিরক্তিতে 'চ' এর মতো শব্দ করে বলল,'এইখানে আবার থামালি কেন?'
আমির পাগড়ী রিদওয়ানের হাতে দিয়ে বলল,'আমার বউ আমার কোলে চড়ে অন্দরমহলে যাবে।'

পদ্মজা কথাটা শুনেই কাচুমাচু হয়ে গেল। আমির পালকির পর্দা সরিয়ে হাত বাড়িয়ে পদ্মজাকে নামতে ইশারা করে। পদ্মজার নাক অবধি টানানো ঘোমটা। আমির সরাতে গিয়েও সরাল না। মুখে বলল,'কী হলো? নেমে আসো।'

পদ্মজা লজ্জায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। সে গাঁট হয়ে বসে থাকে। আমির হেসে এক হাতে নিজের কপাল চাপড়াল। এরপর নিজেই টেনে নামাল পদ্মজাকে। তখনো পদ্মজার নাক অবধি ঘোমটা। আমির চট করে পদ্মজাকে পাঁজাকোলা করে নেয়। পদ্মজা কুঁকড়ে যায়। ভয়ে দুই হাতে আমিরের গলা জড়িয়ে ধরে। আমির যত এগোচ্ছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তার গায়ের উষ্ণতা পদ্মজার শাড়ি ভেদ করে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। অচেনা,অজানা অনুভূতি চারিদিকে যেন জেঁকে বসেছে। মরণ প্রেমের সূত্রপাত হয়তো এখান থেকেই শুরু হয়!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ২৮
_____
অন্দরমহলের সদর দরজায় গ্রামের মেয়েদের ভীড়। তারা সবাই নতুন বউ দেখতে এসেছে। আমিরের কোলে পদ্মজাকে দেখে মিটিমিটি হাসছে। ফিসফিসিয়ে একজন আরেকজনকে কিছু বলছে। ফরিনা ধমক দিয়ে কোলাহল থামিয়ে দেন। আমির দরজার সামনে উপস্থিত হতেই আনিসা বলল,'এইবার বউকে নামান ছোট ভাই। বড় আম্মার পা ছুঁয়ে সালাম করে,এরপর ঘরে ঢুকেন।'

আনিসা আমিরের চাচাতো ভাইয়ের বউ। জাফরের স্ত্রী। দেশের বাইরে থাকে। ঢাকার প্রফেসরের মেয়ে আনিসা। বিয়ের পরপরই স্বামী নিয়ে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমায়। দুই সপ্তাহ আগে ছুটি কাটাতে শ্বশুরবাড়ি আসে। আনিসার কথামতো আমির পদ্মজাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। এরপর দুজন নত হয়ে ফরিনাকে সালাম করল। ফরিনা হেসে ছেলে এবং ছেলের বউকে চুমু খান। আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন,'সুখী হ বাবা। বউয়ের খেদমতে ভালা থাক জীবনভর। আমার কইলাম বছরের মধ্যেই নাতি চাই।'

লাবণ্য মাঝে ফোঁড়ন কাটল,'পদ্ম আমার লগে শহরে যাইব আম্মা। আমরা একলগে কলেজে পড়বাম। নাতি-টাতি পরে পাইবা।'

ফরিনা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো তেড়ে এসে লাবণ্যর গালে চড় বসিয়ে দেন। উঁচু কণ্ঠে বললেন,'আমার কথার পিছে কথা কওনের সাহস দেখাবি না।'

আকস্মিক ঘটনায় সবাই হকচকিয়ে যায়। পদ্মজা অবাক চোখে তাকায়। সামান্য কথার জন্য কোনো মা এতো মানুষের সামনে যুবতী মেয়েকে মারে? লাবণ্য লজ্জায়, অপমানে কাঁপতে থাকে। চোখে টলমল জল নিয়ে স্থান ত্যাগ করে। একরকম পালিয়েই গেল। ফরিনার চোখেমুখে

কাঠিন্যতা ফুটে আছে। পদ্মজা ভয়ে চোখের দৃষ্টি মাটিতে রাখে। ফরিনা পদ্মজার হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে যান।যেতে যেতে বলেন,'মুখে মুখে কথা কইবা না কুনুদিন। যা কই মাইন্যা চলবা। শ্বশুর বাড়ির সব মানুষ হইতাছে গিয়া দেবতার লাহান। তাগোরে সেবা করলেই জান্নাত পাওন যাইবো। নইলে কুনুদিন জান্নাতে পাও দিতে পারবা না। হুনছি তো,তুমি হইছো গিয়া অনেক বাধ্য ছেড়ি। কামে কাজেও দেখাইবা। মনে রাখবা আমার কথা গুলান।'

পদ্মজা মাথা নাড়ায়। মুসলমানদের দেবতার সাথে তুলনা করাটা পদ্মজার ভালো লাগেনি। কিছু কথা গলায় এসে আটকে গেছে। বলার সাহস পাচ্ছে না। ফরিনা আবার বলেন,'হুনো বউ, স্বামীর উপরে কিচ্ছু নাই। স্বামীরেই দুনিয়া ভাববা। মা-বাপ,ভাই-বোন হইছে গিয়া পর। স্বামী আপন। স্বামীর বাইরে কিছু ভাববা না। স্বামী যা কয় তাই মানবা। স্বামীর পা ধুইয়া দিবা নিজের হাতে। স্বামী বইতে কইলে বইবা,উঠতে কইলে উঠবা। হুত্তে কইলে হুইবা। স্বামী যহন কাছে ডাকব না করবা না। আল্লাহ বেজার হইবো। ফেরেশতারা অভিশাপ দিব। দুনিয়াত স্বামীর আদরের থাইকা মধুর আর কিছু নাই। মনে রাখবা।'

পদ্মজা অপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। লজ্জায়,আড়ষ্টতায় সারা শরীর তীব্র গরমে ঘামছে। আনিসা ফরিনাকে ফিসফিসিয়ে বলল,'বড় আম্মা, মানুষ আছে তো অনেক। পরেও বলতে পারতেন।'

আনিসার কথা পুরোপুরি উপেক্ষা করলেন ফরিনা। তিনি পদ্মজাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। আবার বলতে শুরু করলেন,'খালি স্বামী লইয়াও পইড়া থাহন যাইব না। তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি জীবিত আছে। তাগোর সেবা করবা। যহন যা করতে কই করবা। না পারলে কইবা শিখাইয়া দিমু। প্রত্তিদিন ভোরে উঠবা। নামায পইড়া রান্ধাঘরে যাইবা। তহন বাকিসব ভুইলা রান্ধনে মন দিবা।'

আমির কপালের চামড়া কুঁচকে মায়ের কথা শুনছিল। এবার সে ধৈর্য্যহারা হয়ে বলল,'রান্নাবান্না করার জন্য অনেক মানুষ আছে আম্মা। পদ্মজার রাঁধতে হবে না। আর আমার এতো সেবাও লাগবে না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। ভীড় কমাও। আর নিয়মনীতি শেষ করো। এরপর আমার বউ আমার ঘরে ছেড়ে দেও।'

আমিরের কথা শেষ হতেই হাসির রোল পড়ে যায়। পদ্মজা ঠোঁট টিপে হাসল। ফরিনা কিছু কঠিন কথা বলতে প্রস্তুত হোন। আনিসা আমিরকে রসিকতা করে বলল,'আজ তো একসাথে থাকা যাবে না। আরো একদিন ধৈর্য্য ধরেন।'

আমির প্রবল বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করে,'কেন? বিয়ে তো হয়ে গেছে।'

কেউ আমিরের জবাব দিল না। উল্টা সবাই হাসতে থাকল।

'আইজ কাইলরাত্রিরে হতচ্ছাড়া!' বলল শাহানা। জাফরের বড় বোন। আমিরের বিয়ে উপলক্ষে বাপের বাড়ি এসেছে। সাথে নিয়ে এসেছে পুরো শ্বশুরবাড়ি। আমির শাহানাকে প্রশ্ন করল,'কালরাত্রি তো হিন্দুদের নিয়ম। আমি মানি না। আমার বউ আমার ঘরে দিয়ে আসা হোক।'

Kobitor.com

'সবসময় ত্যাড়ামি করিস কেন? আমরাও তো নিয়ম মেনেছি।' বলল জাফর। কণ্ঠে তার গম্ভীর্যতা। তাতেও লাভ হলো না। আমির কিছুতেই এই নিয়ম মানবে না।
ফরিনা,শাহানা,শিরিন,আনিসা,আমিনাসহ অনেকে আমিরকে মানানোর চেষ্টা করল। কারো কথা আমিরের কর্ণগোচর হলো না। তার মধ্যে রিদওয়ান আমিরের সাথে তাল দিল। বলল,' কালরাত্রি-টাত্রি বাদ। এসব নিয়ম মেনে লাভটা হবে কী? যার বউ তাকে তার বউ দিয়ে দেও।'

'তুই চুপ থাক। আগুনে ঘি ঢালবি না।' বললেন আমিনা।

রিদওয়ান চুপসে গেল। থামলো না শুধু আমির। ফরিনাও জেদ ধরে বসে আছেন। তিনি আমির-পদ্মজাকে আজ কিছুতেই একসাথে থাকতে দিবেন না। যেমন মা তেমন তার ছেলে। মজিদ হাওলাদার অনেকক্ষণ যাবৎ এসব দেখছেন। চেঁচামিচি আর নেয়া যাচ্ছে না। তিনি উপর থেকে নেমে আসেন। অন্দরমহল তিন তলার। তৃতীয় তলায় কেউ থাকে না। শুধু ছাদ আছে। ঘর বানানো হয়নি। অসমাপ্ত ইটের পুরনো বাড়ি। চিন্তাভাবনা চলছে,তৃতীয় তলাটা থাকার জন্য উপযুক্ত করার। মজিদকে দেখে সবাই থেমে গেল। তিনি পদ্মজার পাশে চেয়ার নিয়ে বসেন। পদ্মজা একটু নড়েচড়ে বসে। মজিদ পদ্মজাকে জিজ্ঞাসা করলেন,'তুকি কী চাও মা? আজ শ্বাশুড়ির সাথে থাকবে? নাকি আমার পাগল ছেলের সাথে? ভেবে বলো। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

পদ্মজা উসখুস করতে করতে বলল,'জি, আম..আম্মার সাথে থাকব।'

ফরিনার ঠোঁটে বিশ্বজয়ের হাসি ফুটে উঠে। তিনি আমিরের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে হাসেন। পরপরই পদ্মজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। চুমুতে পদ্মজা গাল ভরিয়ে দেন। একবার আড়চোখে আমিরকে দেখল পদ্মজা। আমির তাকিয়েই ছিল। পদ্মজা তাকাতেই আমির চোখ রাঙানি দিল। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মজা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। বিয়ের বাকি সব নিয়ম শুরু হয়। উপর থেকে নেমে আসেন নূরজাহান। তিনি এই বাড়ির প্রধান কর্তী। মজিদ হাওলাদারের জন্মদাত্রী।

'কইরে...কইরে আমার নাত বউডা কই?' বলতে বলতে ছুটে আসেন তিনি। উপস্থিত সবাই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নূরজাহানের দিকে তাকাল। নূরজাহান পদ্মজার সামনে এসে বসেন। পদ্মজার মুখখানা দুই হাতে ধরে দেখেন। এরপর মুগ্ধ হয়ে বললেন,' বাবু দেহি চাঁদ লইয়া আইছে! এই ছেড়ি তোর জন্যি আমার জামাই তো এহন আমার দিকে চাইবোই না।'

নূরজাহান কেন এ কথা বললেন,পদ্মজা ঠাওর করতে পারল না। আমির যখন হেসে বলল,'আরে বুড়ি,তুমি তো আমার প্রথম বউ। ভুলি কীভাবে?' তখন পদ্মজা নূরজাহানের কথার মানে বুঝল। বুঝতে পেরে ঠোঁট চেপে হাসল। নূরজাহান আমিরের থুতুনিতে চিমটির মতো ধরে বললেন,'আমার চান্দের টুকরা। বউরে আদর কইরো ভাই। বকাঝকা কইরো না। ছেড়িডা জন্ম ঘর ছাইড়া আইছে। তুমি এখন সব। তুমি যেমনে রাখবা তেমনেই থাকব। স্বামী হাত ছাইড়া দিলে শ্বশুরবাড়ির আর কেউই বউদের আপন হয় না। বুঝছো ভাই?'

আমির নূরজাহানের পা ছুঁয়ে সালাম করে বলল,'বুঝছি জান।'
নূরজাহান মন খারাপের নাটক করে বললেন,'এইডা ঠিক না ভাই।'
'কোনটা?'
'এহন থাইকা জান ডাকবা বউরে। আমি হইলাম দুধভাত।'

আমির একটু জোরেই হাসল। সাথে আরো অনেকে হাসল। পদ্মজা নত হয় নূরজাহানের পা ছুঁয়ে সালাম করার জন্য। নূরজাহান দ্রুত আটকালেন পদ্মজাকে। জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন,'রূপে যেমন গুণেও তেমন থাইকো বইন।'

'রাইত বাড়তাছে। সব নিয়ম তো শেষ। যাও যের ঘরে যাও। এই তোরা বাড়িত যাইতে পারবি? রাইতের বেলা আইছিলি কেন? বউতো কাইলও দেহন যাইতো। জাফর ছেড়িগুলারে দিয়া আইতে পারবি? মদন কই? মগা কই? কামের বেলা দুইডারে পাওন যায় না।' কথাগুলো একনাগাড়ে বললেন ফরিনা বেগম। তিনি নূরজাহানের উপস্থিতি যেন উপেক্ষা করতে চাইছেন। মদন ছুটে আসে বাইরে থেকে। মাথা নত করে ফরিনাকে বলল,'আইছি খালাম্মা।'

'থাহস কই? যা এদের দিয়া আয়। আমরার বাড়িত যহন আইছে এরা এহন আমরার দায়িত্বে। সুন্দর কইরা বাড়িত দিয়া আইবি।'
'আচ্ছা খালাম্মা। আপারা চলেন!'

মেয়েগুলো সারাক্ষণ হাসছিল। যাওয়ার সময়ও হাসতে হাসতে গেল। মেয়েগুলোর উদ্দেশ্যে রানি ঠোঁট বাঁকায়। তা খেয়াল করল রিদওয়ান। সে রানির মাথায় গাট্টা মেরে বলল,'সারাক্ষণ মুখ মুরাস কেন? একদিন দেখবি আর মুখ সোজা হচ্ছে না। বিয়েও হবে না।'
'না হলে নাই। ছেড়িগুলারে দেখছো বড় ভাই? কেমনে হে হে কইরা হাসতাছিল।'
'তাতে তোর কী?'

নূরজাহান পদ্মজাকে বললেন,'হ মেলা রাইত হইছে। আইয়ো বনু আমার ঘরে আইয়ো। আইজ আমার লগে থাকবা।'
'আপনার লগে ক্যান? পদ্মজায় আমার লগে আমার ঘরে থাকব। হেইডাই তো কথা হইছে। পদ্মজায়ও এইডাই চায়।'
'দেহো বউ, তর্ক কইরো না। নাত বউ আমার পছন্দ হইছে। আমি আমার লগে রাখুম।'
'এই পদ্মজা তুমি কার লগে থাকবা?' ফরিনা কিঞ্চিৎ রাগান্বিত স্বরে প্রশ্ন করেন। পদ্মজার অবস্থা দরজার চাপায় পড়ার মতো। এ কোন জগতে এসে পড়লো সে! পদ্মজা গোপনে ঢোক গিলল। নূরজাহান আমিরকে আদেশ করলেন,'খাড়ায়া রইছস কেন? বউরে কোলে লইয়া আমার ঘরে দিয়া যা।'

আমির পদ্মজাকে কোলে তুলতে গেলে ফরিনা বললেন,'বাবু, আমি তোর মা। তোরে জন্ম দিছি আমি। আমার কথাই শেষ কথা মানবি। আমার ছেড়ার বউ আমার ঘরে থাকব। আমার কথা অমান্য করলে জান্নাত পাইবি না।'
নূরজাহান পদ্মজাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন,'দেখছোনি বনু? এমন কইলজা বড় বউ কেউ ঘরে রাহে? আমি মানুষ ভালা বইলা এই বউরে বাইর কইরা দেই নাই। সহ্য কইরা কইরা এহন মরার পথে আছি।'
'তোমাদের কারোর সাথে থাকতে হবে না। আমার বউ আমার ঘরেই চলুক।' বলল আমির। কণ্ঠে তার খুশির মেলা। সুযোগ বুঝে নিজের জিনিষ নিজে বুঝে নিতে চাইছে। ফরিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমিরের দিকে তাকান। নূরজাহানকে বললেন,'আপনার ঘরেই লইয়া যান।'

ফরিনার কথা শুনে আমিরের মুখটা ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। নূরজাহান হাসলেন। এই হাসি বিজয়ের হাসি।

'ভাই, বউরে কোলে লও। লইয়া আও আমার ঘরে।' নূরজাহান বললেন।
'আমি হেঁটে যেতে পারব। একটু হাঁটা দরকার।' মিনমিনিয়ে বলল পদ্মজা।
'আইচ্ছা তাইলে হাঁটো। ধরো আমার হাত ধরো।' নূরজাহান হাত বাড়িয়ে দেন। পদ্মজা নূরজাহানের হাত শক্ত করে ধরে মৃদু করে হাসলো। নূরজাহান এবং পদ্মজার সাথে আমির আসে। সে দাদীর ঘর অবধি যাবে। পদ্মজাকে তার মোটেও ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

নূরজাহানের ঘরে যাওয়ার পথে পদ্মজা কান্নার সুর শুনতে পায়। কে যেন কাঁদছে। কী করুণ সেই কান্নার স্বর! এদিক-ওদিক দৃষ্টি মেলে তাকাল পদ্মজা। আরেকটু এগোতেই খুব কাছে জোরে একটা আওয়াজ হয়। পদ্মজা কেঁপে উঠে। দ্রুত সেদিকে তাকায়। তার চেয়ে দুই হাত দূরে একটা দরজা। ভেতর থেকে কেউ দরজায় ধাক্কাচ্ছে আর কাঁদছে। পদ্মজাকে ভয় পেতে দেখে আমির বলল,'ভয় পাচ্ছো?'

'কে ওখানে? এভাবে কাঁদছে কেন? দরজা খুলে দিন না!'

পদ্মজা ভয় এবং ব্যথিত কণ্ঠে বললো। তার কথায় আমির বা নূরজাহান কারো কোনো ভাবান্তর হলো না। পদ্মজাকে নিয়ে পাশ কেটে চলে গেল।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ২৯
_____
নূরজাহান শক্ত করে পদ্মজার হাত ধরেন। ক্ষীণ স্বরে বললেন,'ঘরে আহো,পরে কইতাছি।'

কান্নার শব্দ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। নূরজাহান পদ্মজাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকেন। আমির চেয়ার টেনে বসার জন্য প্রস্তুত হতেই নূরজাহান হইহই করে উঠলেন,'তুই বইতাছস ক্যান?'
আমির হকচকিয়ে গিয়ে বলল,'মানে?'
'বউয়ের ধারে আর থাহন যাইবো না। আইজ কাইলরাত্রি।'
'মুসলমানদের কালরাত্রি পালন করতে নেই। গুনাহগার হবেন।' বলল পদ্মজা। তার মাথা নত। প্রথম দিন এসেই কথা বলা ঠিক হলো নাকি ভাবছে।

মুখের উপর কথা শুনে নূরজাহান কড়া চোখে তাকান। পদ্মজা দেখার পূর্বে সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে চোখের দৃষ্টি শীতল রূপে নিয়ে আসেন। তিনি পদ্মজাকে প্রশ্ন করলেন, 'গেরামের রেওয়াজ ফালাইয়া দেওন যাইব?'

Kobitor.com

নূরজাহানের কণ্ঠ স্বাভাবিক। পদ্মজা নির্ভয়ে চোখ তুলে তাকাল। বলল,'যা পাপ তা করতে নেই দাদু। জেনেশুনে ভুল রেওয়াজ সারাজীবন টেনে নেওয়া উচিত না। আমার কথা শুনে রাগ করবেন না।'
'তুমি কী আইজ জামাইয়ের লগে থাকতে চাইতাছো?' নূরজাহানের কণ্ঠ গম্ভীর। এমন প্রশ্নে পদ্মজা ভয় পেয়ে যায় এবং লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠে। আমতা আমতা করে বলল,'ন...ন...না! তে...তেমন কিছু না।'

পদ্মজা আড়চোখে আমিরকে দেখে আবার চোখের দৃষ্টি নত করে ফেলল। আমির নূরজাহানকে জড়িয়ে ধরে বলল,'আমি যাচ্ছি বুড়ি।' এরপর পদ্মজার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে কোমল কণ্ঠে বিদায় জানাল, 'আল্লাহ হাফেজ পদ্মবতী।'

পদ্মজা নতজানু অবস্থায় মাথা নাড়াল। আমির ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে নূরজাহানকে দেখে। ঢোক গিলে বলে,'রাগ করেছেন দাদু?'

নূরজাহান হাসলেন। পদ্মজার এক হাত ধরে বিছানার কাছে নিয়ে যান। বললেন,'আমার বইনে তো ঠিক কথাই কইছে। গুসা করতাম কেরে?'
পদ্মজা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। নূরজাহান বললেন,'তুমি বও। আমি জোসনার মারে ভাত দেওনের কথা কইয়া আইতাছি।'
'আমি খেয়েছি দাদু। তখন খাওয়ালেন আম্মা।'
'ব্যাগডা কই? শাড়িডা খুইলা আরেকটা পরো। সিঁদুর রঙেরডা পরবা।' বলতে বলতে নূরজাহান ব্যাগ থেকে সিঁদুর রঙের শাড়ি বের করলেন। পদ্মজার দিকে এগিয়ে দিলেন। পদ্মজা হাত বাড়িয়ে শাড়ি নিলো। জানতে চাইল,'কোথায় পাল্টাব?'

'খাড়াও দরজা লাগায়া দেই। ঘরেই পাল্ডাও। আমারে শরমাইয়ো না বইন। তোমার যা আমারও তা।'

পদ্মজা শাড়ি হাতে নিয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়ে শাড়ি পাল্টানোর মতো উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে থাকে। পালঙ্কের পিছনে চোখ পড়ে। পদ্মজা সেদিকে গিয়ে শাড়ি পাল্টে নিল। এরপর নূরজাহানের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল,'দাদু,তখন কাঁদছিল কে?'

নূরজাহান বিছানায় বসতে বসতে জবাব দেন,'আমার খলিলের বড় ছেড়ার বউ।'
পদ্মজা দুই কদম এগিয়ে আসে। আগ্রহভরে জানতে চায়,'কেন কাঁদছিল? উনাকে কি ঘরে আটকে রাখা হয়েছে?'
'বও। আমার ধারে বও।'

পদ্মজা নূরজাহানের সামনে ঝুঁকে বসে। নূরজাহান বললেন,' তোমার চাচা হউরের(শ্বশুর) বড় ছেড়ার বউ রুম্পার গত বৈশাখো মাথা খারাপ হইয়া যায়। এরে ওরে মারতে আসে। কেউরে চিনে না। নিজের সোয়ামিরেও চিনে না। আলমগীর তো এহন ঢাহাত থাহে। আমির তো গেরামে আইছে অনেকদিন হইলো। আলমগীর শহরে আমিরের কামডা করতাছে। এর লাইগগাই তো আলমগীর বিয়াতে আছিল না। রুম্পা তোমার হউরিরে দা নিয়া মারতে গেছিল।'

'এজন্য আপনারা ঘরে আটকে রাখেন উনাকে? হুট করে কেন এমন হলেন?' পদ্মজা আঁতকে উঠে জিজ্ঞাসা করল।

নূরজাহান এদিকওদিক তাকিয়ে কী যেন দেখলেন! এরপর সতর্কতার সাথে ফিসফিসিয়ে বললেন,'বাড়ির পিছে বড় জঙ্গলা আছে। দোষী জায়গা। ভুলেও ওইহানে যাইয়ো না। রুম্পা শনিবার ভরদুপুরে গেছিল। এর পরেরদিন জ্বর উডে। আর এমন পাগল হইয়া যায়। এগুলো তেনাদের কাজ! রাতে নাম লওন নাই। তুমি মাশাল্লাহ চান্দের টুকরা। ভুলেও ওইদিকে যাইয়ো না। ক্ষতি হইব।'

নূরজাহানের কথা শুনে পদ্মজার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে মনে ভাবে, অবিশ্বাস্য! ভয় পেয়ে কারো মাথা খারাপ হয়ে যায়?
পদ্মজা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,'উনাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে?'
'হ। দেহানো হইছে তো। শহরে দুইবার লইয়া গেছে। কবিরাজ আইলো। কেউই ভালা কইরা দিতে পারে নাই। আইচ্ছা এসব কথা বাদ দেও এহন। এই বাড়িত যহন বউ হইয়া আইছো সবই জানবা। খালি বাইরে কইয়ো না এই খবর। গেরামের কেউ জানে না। রাইত অইছে ঘুমাও।'

নূরজাহান শুতে শুতে বললেন,'হুনো জামাইয়ের কাছে কইলাম যাইবা না।'
'না,না...যাব না।'
'বুঝলা বইন,তোমার দাদা হউরে বিয়ার প্রত্তম রাইতে লুকাইয়া আমারে তুইলা নিজের ঘরে লইয়া গেছিল। আদর-সোহাগ কইরা ভোর রাইতে পাডাইয়া দিছিল। আমি ছুডু আছিলাম। তাই ডরে কইলজা শুকায়া গেছিল।'

বলতে বলতে নূরজাহান জোরে হেসে উঠেন। পদ্মজা মৃদু করে হাসে। নূরজাহান ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়েন। পদ্মজা ধীরে ধীরে এক কোণে কাচুমাচু হয়ে শুয়ে পড়ে। কী অদ্ভুত সব! সাধারণত বিয়ের রাতে নতুন বউরা ঘুমানোর সুযোগ পায় না। জামাইয়ের বাড়ির মানুষেরা সারাক্ষণ ভীড় করে ঘেঁষে থাকে। পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। হারিকেনের আগুন নিভু নিভু করে জ্বলছে। নিভে যাবে যেকোনো মুহূর্তে। কেটে যায় অনেকক্ষণ। ঘুম আসছে না। দেহ অচেনা অনুভূতিতে ছেয়ে যাচ্ছে। আচমকা পদ্মজা ভ্রু কুঁচকে ফেলে। কান খাড়া করে ভাল করে শোনার চেষ্টা করে। আবার কাঁদছে! রুম্পা মিনমিনিয়ে কাঁদছে। পদ্মজা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। সাথে সাথে নূরজাহান পদ্মজার দিকে ফিরেন। জানতে চান,'ডরাইতাছো?'
'উনি আবার কাঁদছেন।'
'সারাবেলাই কান্দে। এইসবে কান দিও না। ঘুমাইয়া পড়ো।'

পদ্মজা উসখুস করতে করতে শুয়ে পড়ে। হারিকেন নিভে যায়। নূরজাহান ঘুমে তলিয়ে যান। নাক ডাকছেন তিনি। নাক ডাকার তীব্রতা অনেক। যা পদ্মজাকে বিরক্ত করে তুলে। পদ্মজা ঘুমানোর চেষ্টা করে। হাজার ভাবনার ভীড়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। শেষ রাতে ঘুমের ঘোরে অনুভব করে, হাঁটুতে কারো হাতের ছোঁয়া। পদ্মজা চোখ খুলে। মুখের সামনে কেউ ঝুঁকে রয়েছে। পদ্মজা ধড়ফড়িয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল,'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ অবয়বটি ছুটে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা কাঁপতে থাকল। শরীর বেয়ে ঘাম ছুটছে। ভয়ে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। সে নূরজাহানকে ভয়ার্ত স্বরে ডাকে,'দাদু...দাদু।'

নূরজাহান একটু নড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পদ্মজা আর ডাকল না। সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে। তার চোখের দৃষ্টি দরজার বাইরে। মস্তিষ্ক ভাবছে, দরজা তো লাগানো ছিল। বাইরে থেকে কেউ কীভাবে ঢুকলো? নাকি এর মাঝে দাদু টয়লেটে গিয়েছিলেন? পদ্মজার বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে। সে জিহ্বা দিয়ে শুকনা ঠোঁট ভিজিয়ে নিলো। একটু ভয় ভয় করছে। কে এসেছিল! এভাবে গায়ে হাত দিচ্ছিলো কেন? পদ্মজা চোখ খিঁচে ছিঃ বলে আগন্তুকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। বাকি রাতটুকু আর ঘুম হলো না তার। ভয়টা কমেছে। এই জায়গায় পূর্ণা থাকলে হয়তো পুরো বাড়ি চেঁচিয়ে মাথায় তুলে ফেলতো। পদ্মজা মনে মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে,এরকম ঘটনা পূর্ণার জীবনে যেন না আসে। একদম গুড়িয়ে যাবে। উঠে দাঁড়াতে পারবে না। পূর্ণার কথা মনে পড়তেই পদ্মজার বুকটা হু হু করে উঠল। কান্না পায়। অন্যদিন পাশে পূর্ণা থাকে। আজ নেই!

ফজরের আযান পড়তেই নূরজাহান চোখ খুলেন। বিছানা থেকে নেমে দেখেন,পদ্মজা জায়নামাজে দাঁড়াল মাত্র। তিনি প্রশ্ন করলেন,'ওযু করলা কই?'
'জি, কলপাড়ে।'
'চিনছো কেমনে?'
পদ্মজা হাসলো। বলল,'খুঁজে বের করেছি।'
নূরজাহান চোখমুখ শক্ত করে বলেন,'নতুন বউ রাইতের বেলা একলা ঘুরাঘুরি কইরা কল খোঁজার কী দরকার আছিল? আমারে ডাকতে পারতা।'
পদ্মজার মাথা নত করে অপরাধী স্বরে বলল,'ক্ষমা করবেন দাদু।'
'কি কাল আইলো। আইচ্ছা,পড়ো এহন। নামায পড়ো।'

নূরজাহান অসন্তুষ্ট ভাব নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।
পদ্মজার দুই চোখ ছলছল করে উঠে। যখন টের পেল এখুনি সে কেঁদে দিবে,দ্রুত ডান হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছে। এরপর নামাযে মন দিল।

পদ্মজাকে কাতান শাড়ি পরানো হয়েছে। বউভাতের অনুষ্ঠান চলছে। সে এক বিশাল আয়োজন। বিয়ের চেয়েও বড় করে বউভাতের অনুষ্ঠান হচ্ছে। অলন্দপুরের বাইরে থেকেও মানুষ আসছে পদ্মজাকে দেখার জন্য। আটপাড়ার প্রতিটি ঘরের মানুষ তো আছেই। পদ্মজার চারপাশে মানুষের গিজগিজ। রাতে ঘুম হয়নি। পরনে ভারী শাড়ি,গহনা। এতো মানুষ চারিদিকে। সব মিলিয়ে পদ্মজার নাজেহাল অবস্থা। মাথা নত করে বসে আছে সে।

'আপা।'

পূর্ণার কণ্ঠ শুনে মুহূর্তে পদ্মজার ক্লান্তি উড়ে যায়। চকিতে চোখ তুলে তাকায়। পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ্মজার উপর। পূর্ণা আওয়াজ করে কেঁদে উঠে বলল,'রাতে আমার ঘুম হয়নি আপা।'
পদ্মজার গলা জ্বলছে। প্রেমা,পূর্ণা,প্রান্তকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে। চাপা কণ্ঠে বলে,'আমারো ঘুম হয়নি বোন।'
'আপা চল,বাড়ি চল।'

'কাইল যাইব। আইজ না। এহন পদ্মজা আমরার বাড়ির ছেড়ি।' লাবণ্য বলল। সে সবেমাত্রই এই ঘরে ঢুকল। পদ্মজার জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। পূর্ণা রাগ নিয়ে বলে,'আমার বোন আমি নিয়ে যাবো।'
'আমাদের আপা আমরা নিয়ে যেতে এসেছি।' বলল প্রান্ত।
রানি প্রান্তর কান টেনে ধরে বলল,'পেকে গেছিস তাই না?'
'উ! ছাড়ো রানী আপা। ব্যথা পাচ্ছি।'
'ওরেম্মা! তুই শুদ্ধ ভাষাও শিইখা লাইছস?' রানি অবাক হয়ে জানতে চাইল। প্রান্ত অভিজ্ঞদের মতো হেসে বলল,'ইয়েস।'

যারা যারা প্রান্তকে চিনে সবার চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। প্রান্ত একটি ইংরেজি শব্দ বলেনি যেন মাত্রই এখানে বজ্রপাত ঘটাল। রানি চোখেমুখে বিস্ময়ভাব রেখে বলল,'এইটা মুন্না না অন্য কেউ।'

'আমি মুন্না না আমি প্রান্ত। প্রান্ত মোড়ল।' প্রান্তের বলার ভঙ্গী দেখে সবাই হেসে উঠল। পদ্মজা হাসতে হাসতে রানিকে বলল,'প্রান্ত অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ শিখেছে।'

'বউ মানুষ কেমনে দাঁত বাইর কইরা হাসতাছে দেখছো? বেহায়া বউছেড়া।' কথাটি দরজার পাশ থেকে কেউ বলল। অন্য কেউ শুনতে না পেলেও পদ্মজা শুনতে পেল। সে সেদিকে তাকাল। অল্প বয়সী দুজন মহিলা এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন পদ্মজাকে চোখ দিয়ে গিলে খাবে। পদ্মজা তাদের উদ্দেশ্যে হাসে। পদ্মজার হাসি দেখে মহিলা দুজন থতমত খেয়ে গেল। দুজন চাওয়াচাওয়ি করে আবার পদ্মজার দিকে তাকাল। পদ্মজা ততক্ষণে চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

_____
অতিথি আপ্যায়ন চলছে ধুমধামে। রমিজ আলী,কামরুল,রজব সবাই উপস্থিত রয়েছে। খাওয়া শেষে তারা আড্ডা শুরু করে।
রমিজ বললেন,'মনজুর ছেড়া,জলিল,ছইদ এরা কী আইছে?'
কামরুল দাঁতের ফাঁক থেকে যত্ন করে গরু মাংস বের করেন। এরপর উত্তর দেন,'না আহে নাই। হেদিন ছইদের বাপে আমার কাছে গেছিল।'
'কেরে গেছিল?'
'ছইদরে যাতে মাতব্বরের হাত থাইকা বাঁচায়া দেই।'
'হেরা এহন কই আছে?'
'আছে কোনহানে। কয়দিন পর পরই তো উধাও হইয়া যায়। এহনের ছেড়াদের দায়-দায়িত্ব নাই বুঝলা। আমার যহন দশ বছর তহন ক্ষেতে কাজ করতে যাইতাম।'
কামরুলের কথা উপেক্ষা করে রমিজ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন,'ক্ষমতা যার বেশি হের সুখ বেশি। আমার মাইয়াডা নির্দোষ আছিল। তবুও কেমনডা করছিল সবাই? আইজ মাতব্বরের ছেড়া বলে কিচ্ছুই হইল না। বদলা আমরা বিয়া খাইতে আইছি।'

রমিজের অসহায় মুখখানা দেখে কামরুল,রজব,মালেক হো হো করে হেসে উঠলেন। রমিজের দৃষ্টি অস্থির। পেট ভরে খাওয়ার লোভে এখানে এসেছেন তিনি। নয়তো এখানে আসার এক ফোঁটাও ইচ্ছে ছিল না।

_____
পদ্মজা কিছুতেই খেতে পারছে না। অথচ ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। চোখের সামনে এতো মানুষ থাকলে কী খাওয়া যায়। পূর্ণা ব্যাপারটা ধরতে পেরে লাবণ্যকে বলল। লাবণ্য সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলে। কেউ শুনে না। তাই সে ফরিনা বেগমকে নিয়ে আসে। ফরিনা বেগম সবাইকে বের করে, দরজা ভিজিয়ে দিয়ে যান। ঘরে শুধু রানি,লাবণ্য,পদ্মজা,প্রেমা,পূর্ণা এবং প্রান্ত। পদ্মজা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। পূর্ণা বলে,'আপা আমি তোমাকে খাইয়ে দেই?'

পদ্মজা অবাক হয়ে তাকাল। ঠোঁটে ফুটে মিষ্টি হাসি। পূর্ণা অনুমতির অপেক্ষা না করে এক লোকমা ভাত বাড়িয়ে দিল। পদ্মজার দুই চোখ ছলছল করে উঠে। পূর্ণা কখনো খাইয়ে দেয়নি। এই প্রথম খাওয়াতে চাইছে। পদ্মজা হা করে। লাবণ্য হেসে বলল,'আমার এমন একটা বইন যদি থাকতো।'
'আমি তোর বইন না?' বলল রানি।
লাবণ্য চোখমুখ শক্ত করে বলল,'জীবনে খাইয়ে দিছস? আবার বইন কইতে আইছস যে।'
'তুই খাইয়ে দিছস? পূর্ণা তো ছুটু। তুইও তো ছুটু।'
'আগে পদ্মজা খাওয়াইছে। এরপর পূর্ণা।'
'আইচ্ছা ভাত লইয়া আয়। খাওয়াই দিমু।' রানি বলল।
'এহন পেট ভরা।'
'হ,এহন তো তোর পেট,নাক,মাথা সবই ভরা থাকব।'

দুই বোনের ঝগড়া দেখে পূর্ণা,পদ্মজা হাসে। কী মিষ্টি দুজন। ঝগড়াতেও যেন ভালোবাসা রয়েছে। লাবণ্যের চেয়ে রানি বেশি সুন্দর। তবে,লাবণ্যকে দেখলে বেশি মায়া লাগে। লাবণ্য যে রাগী দেখলেই বোঝা যায়। গতকাল কি রাগটাই না দেখাল! ঘরে ঢুকল আমির। আমিরকে দেখেই পদ্মজা সংকুচিত হয়ে গেল। রানি প্রশ্ন করল,'এইহানে কী দাভাই?'

'পদ্মজাকে নিয়ে যেতে হবে। ওহ খাচ্ছে। আচ্ছা,খাওয়া শেষ হলে নিয়ে যাবো।' বলতে বলতে আমির পদ্মজার সামনে বসল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল,'কই নিয়ে যাবা?'
'আম্মার ঘরে।'
'কেন?'
'আম্মা বলছে নিয়ে যেতে।'
'আম্মা একটু আগেই দেইখা গেল।'
আমির হকচকিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল,'ওহ তাই নাকি?'
রানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমিরকে পরখ করে নিয়ে বলল,'দাভাই,মিথ্যে বলছো কেন?'
'মি...মিথ্যে আমি? অসম্ভব। আম্মা না দাদু বলছে নিয়ে যেতে। এই তোরা যা তো। তোদের বান্ধবিরা আসছে। যা। হুদাই ঘেনঘেন শুরু করেছিস।'

লাবণ্য কথা বাড়াতে চাচ্ছিল। রানি টেনে নিয়ে যায়। প্রেমা,প্রেমাও বেরিয়ে যায়। তারা বাড়ি থেকে পরিকল্পনা করে এসেছে, একসাথে পুরো হাওলাদার বাড়ি ঘুরে দেখবে। পূর্ণা খাইয়ে দিচ্ছে। পদ্মজা আমিরের উপস্থিতিতে বিব্রত হয়ে উঠেছে। খাবার চিবোতে পারছে না। আমির পদ্মজাকে বলল,'বড় ভাবি বলল,রাতে নাকি ঘুমাওনি।'

'না। হ্যাঁ। আসলে ঘুম আসেনি।'
'ঘুমাবে এখন?'
'না,না। কী বলছেন? বাড়ি ভর্তি মানুষ।' পদ্মজা দ্রুত বলল। আমিরের চোখের দিকে তাকিয়ে। কথা শেষ হতেই চোখ নামিয়ে নিল।
আমির বলল,'আচ্ছা,খাও। আমি আসছি।'
'আপনি কী রাতে দাদুর ঘরে এসেছিলেন?'
আমির চলে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল। এই কথা শুনে চমকে তাকাল। পদ্মজার দিকে ঝুঁকে জানতে চাইলো,'কেন? কেউ কী এসেছিল তোমার ঘরে?'

আমিরের এমন ছটফটানি দেখে পদ্মজা খুব অবাক হলো। সে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল,'হ্যাঁ, এসেছিল। শেষ রাত্রিরে।'

'আচ্ছা।' বলেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল আমির। পদ্মজা পিছনে ডাকল, শুনল না আমির। হুট করে আমিরের পরিবর্তন পদ্মজাকে ভাবাতে লাগল।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ
(ভুলক্রুটি এড়িয়ে যাবেন। তাড়াহুড়োতে লিখেছি।)

আমি পদ্মজা - ৩০
_____
পদ্মজাকে নতুন করে আবার সাজানো হয়েছে। বাসর রাত নিয়েও হাওলাদার বাড়ির হাজারটা রীতি। সেসব পালন হচ্ছে। পদ্মজা নিয়ম-রীতি পূরণ করছে ঠিকই,তবে মন অন্য জায়গায়। বিকেলে সে দেখেছে, আমির রিদওয়ানের পাঞ্জাবির কলার দুই হাতে ধরে কিছু বলছে। খুব রেগে ছিল। তবে কী রিদওয়ানই এসেছিল রাতে?

'ও বউ উডো। এহন ঘরে গিয়া খালি দুইজনে মিললা দুই রাকাত নফল নামায পইড়া লইবা। আনিসা যাও লইয়া যাও। দিয়া আও ঘরে।' বললেন ফরিনা। পদ্মজা কল্পনার জগত থেকে বেরিয়ে বাস্তবে ফিরে আসে। খলিল হাওলাদারের দুই মেয়ে শাহানা,শিরিন এবং আনিসা পদ্মজাকে নিয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠে। আমিরের ঘরে ঢুকতে আর কয়েক কদম বাকি। পদ্মজা ঘোমটার আড়াল থেকে চোখ তুলে তাকায়। দরজা গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো। টকটকে লাল গোলাপ। হাওলাদার বাড়ির গোলাপ বাগান অলন্দপুরে খুবই জনপ্রিয়। পদ্মজার শুভ্র, শীতল অনুভূতি হয়। কত সুন্দর দেখাচ্ছে! ঘরে ঢুকতেই তাজা গোলাপ ফুলের ঘ্রাণে শরীর-মন অবশ হয়ে আসে। শুধু বিছানা নয়,পুরো ঘর লাল গোলাপ দিয়ে সাজানো।

শাহানা পদ্মজাকে বিছানায় বসিয়ে দিল। এরপর বলল,'ডরাইবা না। রাইতটা উপভোগ করবা। এমন রাইত জীবনে একবারই আসে।'

পদ্মজার লজ্জায় মরিমরি অবস্থা! সারা দেহ থেকে যেন গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। আনিসা সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখছে। একসময় বলল,'আমার বাসর রাতটাও হুবুহু এই রকম ছিল। চারিদিকে গোলাপের ঘ্রাণ। ফুলের ঘ্রাণে ভালোবাসা আরো জমে উঠেছিল।'

'এই বাড়ির বউদেরই কপাল। আমরা এই বাড়ির ছেড়ি হইয়াও জামাইর বাড়িতে বাসর রাইতের ঘর কাগজের ফুল দিয়ে সাজানি দেখতে হইছে।' বলল শিরিন। আনিসা কণ্ঠে অহংকার ভাব নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলল,'এসব পেতে যোগ্যতা লাগে। যোগ্যতা ছাড়া ভালো কিছু পাওয়া যায় না। আমি উচ্চশিক্ষিত এবং সুন্দরী ছিলাম। ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য ছিলাম তাই পেয়েছি। আর পদ্মজা যথেষ্ট সুন্দরী, গ্রামে থেকেও পড়ালেখায় খুব ভালো। তাই সেও যোগ্য। তোমাদের না আছে পড়াশোনা না আছে কোনো ভাল গুণ। গায়ের রঙও ময়লা। কাগজের ফুলই তোমাদের জন্য ঠিক ছিল।'

আনিসার কথাগুলো শুনতে পদ্মজার খুব খারাপ লাগে। কোনো মানুষকে এভাবে বলা ঠিক না। শিরিন হইহই করে উঠল,'এই রূপ বেশিদিন থাকব না ভাবি। এতো দেমাগ ভালা না। বিয়ার এতদিন হইছে একটাও বাচ্চা দিতে পারছো? পারো নাই। তাইলে এই গরিমা (অহংকার) দিয়া কী হইবো? সন্তান ছাড়া নারীর শোভা নাই।'

আনিসা রেগেমেগে ফুঁসে উঠে। গলা উঁচু করে বলে,'সমস্যা আমার নাকি তোমাদের পেয়ারের ভাইয়ের সেটা খোঁজ নাও আগে। আমি এখুনি জাফরকে সব বলছি। এতদিন পর বাড়িতে এসেছি এসব নোংরা কথা সহ্য করতে? অপমান সহ্য করতে? কালই চলে যাব আমি।'

আনিসা রাগে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা হতবাক।শাহানা শিরিনকে ধাক্কা দিয়ে বলল,'এত কিছু কেন কইতে গেলি? জানস না,এই ছেড়ি কেমন? আমি হের বড় হইয়াও হেরে কিছু কই না। এহন আরেক ভেজাল হইবো।'

'যা হওয়ার হইয়া যাক। আমরারে কেমনে পায়ে ঠেলতাছিল দেহো নাই? এইডা তো আমরার বাপের বাড়ি। এতো কথা কেন হুনতে হইবো?' শিরিনের কণ্ঠ কঠিন। সে আজ এর শেষ দেখেই ছাড়বে।

'নতুন বউডার সামনে এমনডা না করলেও হইতো। ও পদ্ম তুমি বেজার হইয়ো না। এরা সবসময় এমনেই লাইগা থাহে।'

পদ্মজা হাসার চেষ্টা করে। শাহানা দরজার বাইরে থাকিয়ে দেখে আমির আসছে নাকি। রাত তো কম হলো না। শাহানা আরো অনেকক্ষণ সময় নিয়ে পদ্মজাকে বুঝালো। কী কী করতে হবে, কীভাবে স্বামীকে আঁচলে বেঁধে রাখতে হয়। পদ্মজা সব মনোযোগ সহকারে শুনে।

আমির ঘরে ঢুকতেই শাহানা,শিরিন বেরিয়ে গেল। আমির দরজা লাগিয়ে পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়ায়। পদ্মজা পালঙ্ক থেকে নেমে আমিরের পা ছুঁয়ে সালাম করে। আমির দুই হাতে পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড় করায়। অনুভব করে পদ্মজা কাঁপছে। প্রচন্ড শীতে মানুষ যেভাবে কাঁপে,ঠিক তেমন। আমির দ্রুত ছেড়ে দেয়। বলে,'পানি খাবে?'

পদ্মজা মাথা নাড়িয়ে জানায়, সে পানি খাবে। আমির এক গ্লাস পানি এগিয়ে দেয়। পদ্মজা এক নিঃশ্বাসে ঢকঢক করে পানি শেষ করে। সারা শরীর কাঁপছে। শাহানা,শিরিন বের হতেই বুকে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়। ঘরে চারটা হারিকেন জ্বালানো। যেদিকে চোখ যায় সেখানেই গোলাপ ফুল। ফুলের ঘ্রাণে চারিদিক মৌ মৌ করছে। এমন পরিবেশে বিয়ের প্রথম রাতে পর পুরুষকে স্বামী রূপে দেখা কোনো সহজ অনুভূতি নয়। আমির গ্লাস নিতে এগিয়ে আসলে পদ্মজা আঁতকে উঠে,এক কদম পিছিয়ে যায়। আমির একটু শব্দ করেই হাসে। পদ্মজা ভীতু ভীতু চোখে তাকায়। আমির বলে,'হাতে গ্লাস নিয়ে সারারাত কাটাবে নাকি? দাও আমার কাছে।'

আমির গ্লাস টেবিলের উপর রেখে আসে। পদ্মজা পালঙ্কের এক কোণে চুপটি করে বসে আছে। তার ডান পা অনবরত কাঁপছে। মনে মনে দোয়া করছে, মাটি যেন ফাঁক হয়ে যায়। আর সে তার ভেতর ঝাঁপ দিয়ে পাতালে হারিয়ে যেতে চায়। নয়তো লজ্জা,আড়ষ্টতায় প্রাণ এখুনি গেল বুঝি! আমির দূরত্ব রেখে পদ্মজার সোজাসুজি বসে। পদ্মজার এক পা যে কাঁপছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার দৃষ্টি অস্থির। এদিকওদিক তাকাচ্ছে। আমির মজা করে জানতে চাইল,'পালানোর পথ খুঁজছো নাকি?'
'না..না তো।' বলল পদ্মজা।
'তাহলে কী খুঁজছো?'

পদ্মজা নিরুত্তর রইল। আমির পদ্মজার আরো কাছে এসে বসে। এক হাতে পদ্মজার এক হাত ছুঁতেই পদ্মজা,' ও মাগো!' বলে চিৎকার করে উঠে। আমির পদ্মজার আকস্মিক চিৎকারে থতমত হয়ে গেল। পদ্মজা ভয়ে ঢোক গিলে। সময়টা যেন যাচ্ছেই না। সে যদি পারতো পালিয়ে যেতো। ভয়ংকর অনুভূতিদের খেলা চারিদিকে! আমির হা করে পদ্মজার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। এরপর দূরে গিয়ে বসে,পদ্মজাকে বলল,'আমার সাথে সহজ হওয়ার চেষ্টা করো। আমার দিকে ফিরে বসো। গল্প করি।'

পদ্মজা আমিরের দিকে ফিরে বসে। তবে দৃষ্টি বিছানার চাদরে নিবদ্ধ। আমির প্রশ্ন করে,'আমার সম্পর্কে কতটুকু জানো?'
'খুব কম।' মিনমিনিয়ে বলল পদ্মজা।
'আমি তোমার চেয়ে বারো বছরের বড়। জানো?'
'এখন জানলাম। তবে আপনার আচরণ ছোটদের মতো।' পদ্মজা মৃদু হেসে আমিরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল। আমির বলল,' আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আরো আছে।'
'বুঝতে পেরেছি। আপনার কথাবার্তা এখন বড়দের মতো মনে হচ্ছে।'
'ঢাকা আমার ব্যবসা আছে।'
'শুনেছি।'
'আমার সাথে তোমাকেও ঢাকা যেতে হবে।'
'আচ্ছা।'
'এই বাড়ির চেয়েও বিশাল বড় বাড়িতে আমি একা থাকি। যতক্ষণ বাইরে থাকব তোমাকে একা থাকতে হবে। ভয় পাওয়া যাবে না।'
'আমি ভয় পাই না।'
'আমাকে তো ভয় পাচ্ছো।' আমির হেসে বলল। পদ্মজা নিরুত্তর।
'কথা বলো।'
'কী বলব?'

Kobitor.com

'আচ্ছা, আসো একটা মজার খেলা খেলি।'

পদ্মজা উৎসুক হয়ে তাকাল। আমির বলল,'দুজন দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকব। যার চোখের পলক আগে পড়বে সে হেরে যাবে।'

পদ্মজা খেলতে রাজি হয়। এই খেলাটা সে পূর্ণার সাথেও খেলেছে। পদ্মজা অনেকক্ষণ এক ধ্যাণে তাকিয়ে থাকতে পারে। তাই তার আত্মবিশ্বাস আছে, সেই জিতবে। বরাবরই জিতে এসেছে। আমির এক,দুই, তিন বলে খেলা শুরু করে। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকে একধ্যাণে। পদ্মজা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমিরকে পরখ করে। আমিরের চুল খাড়া করে উল্টা দিকে ফিরানো। থুতুনির নিচে কাটা দাগ। গালে হালকা দাঁড়ি। শ্যামলা গায়ের রঙ। ঘন ভ্রু,চোখের পাঁপড়ি। পরেছে সাদা পাঞ্জাবি। এতো বেশি ভালো লাগছে দেখতে। আমির পদ্মজার রূপে আগে থেকেই দিওয়ানা। তার উপর এতক্ষণ তাকিয়ে থেকে অনুভূতির দফারফা অবস্থা। সে মুগ্ধ হওয়া কণ্ঠে বলল,'পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নারী আমার বউ। কী ভাগ্য আমার!'

'আপনিও সুন্দর।' কথাটা মুখ ফসকে বলে উঠল পদ্মজা। যখন বুঝতে পারল লজ্জায় মাথা নত করে ফেলল। আমির খুশিতে বাকবাকুম হয়ে বলল,'তোমার পলক পড়েছে। আমি জিতে গেছি।'

পদ্মজা লজ্জায় নখ খুঁটতে থাকে। আমির নিজের চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল,'আমি জানি আমি কতোটা সুন্দর! রঙটা একটু কালো হতে পারে। তবে আমি সুন্দর। তোমার মুখে শোনার পর থেকে ধরে নিলাম,পৃথিবীর সেরা সুন্দর পুরুষের নাম আমির হাওলাদার।'

পদ্মজার দুই ঠোঁট নিজেদের শক্তিতে আলগা হয়ে গেল। সে আমিরের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, মানুষ নিজের প্রশংসা নিজে কীভাবে করতে পারে। আমিরের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, সে সত্যিই পৃথিবীর সেরা সুন্দর পুরুষ। পদ্মজা ফিক করে হেসে দিল। আমির তাকাল। বলল,'হাসছো কেন?'

পদ্মজা হাসি চেপে বলল,'কই না তো। আপনার আম্মা বলেছিলেন, দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতে।'
'আমার আম্মা তোমার আম্মা না?'
'হুম।'
'এখন থেকে আপনার আম্মা না শুধু আম্মা বলবে। গয়নাগাটি নিয়েই নামায পড়বে? অস্বস্তি হবে না? খুলো এবার।'
পদ্মজা অবাক হয়ে জানতে চাইল,'শিরিন আপা বললেন, গয়নাগাটি নাকি স্বামি খুলে দেয়। তাহলে?'
আমির তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে বলল,'তাই নাকি? দাও খুলে দেই।'
পদ্মজা দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল। আমতাআমতা করে বলল,'এ..এটা বোধহয় নিয়ম না। তাই আপনি জানতেন না। আমি...আমি পারব।'

দুই রাকাত নফল নামাযের সাথে তাহাজ্জুদের নামাযটাও পড়েছে দুজন। আমির তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ম জানে না। পদ্মজা হাতে কলমে শিখিয়েছে। আমিরও মন দিয়ে শিখেছে এবং

নামায পড়েছে। এরপর পদ্মজা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার সামনে বিশাল বড় জঙ্গল। সে আমিরকে প্রশ্ন করল,'এই জঙ্গলে নাকি কী আছে?'

আমির পদ্মজার প্রশ্ন শুনেনি। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পদ্মজার দিকে। গায়ে কোনো অলংকার নেই। খোলা চুল কোমর অবধি এসে থেমেছে। মধ্য রাতের বাতাসে তার চুল মৃদু দুলছে। আমির অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেয়। পদ্মজার কোমর পিছন থেকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে,পদ্মজার কেঁপে উঠে বড় করে নিঃশ্বাস নেয়া অনুভব করে গভীরভাবে। পদ্মজার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। পায়ের তলার মাটি শিরশির করে উঠে। তবে,অদ্ভুত বিষয় শুরুর মতো আমিরের স্পর্শ অস্বস্তি দিচ্ছে না তাকে। বরং ধারালো কোনো অজানা অনুভূতিতে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমির পদ্মজার ঘাড়ে থুতুনি রেখে বলল,'প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিনই মনে মনে পণ করি তোমাকেই বিয়ে করব। তবে ভাবিনি প্রথম দিনই আমার কারণে এতোটা অপদস্থ হতে হবে তোমাকে। অনেক চেষ্টা করেছি সব আটকানোর, পারিনি। সেদিনই বাড়ি ফিরে আব্বাকে বলি,আমি বিয়ে করতে চাই পদ্মজাকে। প্রথম প্রথম কেউ রাজি হচ্ছিল না। পরে রাজি হয়ে যায়। মনে হচ্ছে,চোখের পলকে তোমাকে পেয়ে গেছি।'

পদ্মজা নিশ্চুপ। সে অবাধ্য, অজানা অনুভূতিদের সাথে যুদ্ধ করবে নাকি সখ্যতা করবে ভাবছে। আমির পদ্মজাকে ঘুরিয়ে নিজের দিকে ফেরায়। পদ্মজা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। আমির বলল,'তোমায় আমি পদ্ম ফুল দিয়ে একদিন সাজাব। নিজের হাতে সাজাব।'

'কথা বলো। আল্লাহ,আবার কাঁপছো! আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো, স্থির হতে পারবে। এই কী হলো?'

পদ্মজা শরীরের ভার ছেড়ে দিয়েছে আমিরের উপর। আমির দুই হাতে শক্ত করে ধরে রাখে। সেদিন রাতে জান্নাতের সুবাস এসেছিল ঘরে। পদ্মজা নিজের অস্তিত্বের পুরো অংশ জুড়ে স্বামীরূপে একজন পুরুষকে অনুভব করে। ভালোবাসাটা শুরু হয় সেখান থেকেই। মন মাতানো ছন্দ এবং সুর দিয়ে শুরু হয় জীবনের প্রথম প্রেম,প্রথম ভালবাসা।

চলবে...

Kobitor.com